বিশ্ব হিন্দু পরিষদ
ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

# বিশ্ব হিন্দু বার্তা

মূল্য : ১৫ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্
ওঁ
ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৫২তম বর্ষ ◆ প্রথম সংখ্যা ◆ ভাদ্র, ১৪৩৩ [আগস্ট, ২০২৬]

(Visualization : Prashant Singhania)

CENTURYPLY
CLUB PRIME
ISSE BETTER INVESTMENT
HAI TOH BATAO!
E0 EMISSION COMPLIANT
It is a Zero Emission ply, causing the least emission of formaldehyde, making it a ply for the planet.
CALIBRATED
It is uniformly thick with a super smooth surface, thanks to cutting-edge technology. It is ideal for lamination and creation of modular furniture.
DUPLICATE PROOF
It comes with a unique QR code. When scanned with the CenturyPromise app, it authenticates that the ply is genuine and also generates e-warranty.
FIRE RETARDANT
It comes with Firewall Technology that delays spread of fire. It emits very little smoke and self-extinguishes when source of fire is removed.
CUSTOMER SERVICE IN 48 HRS
24X7
In the highly unlikely event of a complaint, the product team at CenturyPly will contact the customer within 48 hrs and resolve the issue.
30-YEAR WARRANTY
It is the only ply from CenturyPly that passes 25 stringent tests as per Bureau of Indian Standards. No wonder it comes with a 30-year warranty.
BORER & TERMITE PROOF, BOILING WATERPROOF
+
EVERYTHING A PREMIUM PLYWOOD CAN OFFER
QUALITY GUARANTEED
by CENTURYPLY
+91 33 39403950
1800-5722-122
To know more, SCAN
Visit website for more details

**কল্যাণ বাণী**

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়।। ১৮/২৯।।

'হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), গুণ অনুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিনরকম প্রভেদ নিঃশেষে এবং পৃথক পৃথক ভাবে বলছি শোন।'

## সম্পাদকীয়...

সম্প্রতি দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্র আন্দোলনের নামে (জেন-জি) অনেক মানুষ ধর্ণা প্রদর্শনে নামেন। গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ধর্ণা দেওয়ার, প্রদর্শন করার সকলেরই অধিকার আছে। কিন্তু হঠাৎ করে সংসদ চলাকালীন সংসদ ভবন ঘেরাও করার নামে যেভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হল, তা অবশ্যই ভাবনার বিষয়। পুলিশ যখন ভীড় সরানোর জন্য জল কামান চালায়, তখন ওরা রেইন ডান্স শুরু করে দেয়। লাঠিচার্জ করার সময় সমবেত ভাবে রাষ্ট্রগান বা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করে দেয়। টিয়ার গ্যাস চালালে, গ্যাস মাস্ক কিংবা ভেজা কাপড় ব্যবহার করে। পুলিশকর্তা তাদের বোঝাতে গেলে বলতে শুরু করে 'বাস্তেগুনা হুইয়াঁ', এই শব্দের কি অর্থ বোঝাই দায়। বাস্তবে এটাই হচ্ছে জেন-জি-দের ভাষা, যাদের প্রথম চিন্তা হচ্ছে 'আমাদের নিজেদের জীবন নিজেদের পদ্ধতিতে অতিবাহিত করতে হবে, দুনিয়া উচ্ছন্নে যাক।' এই প্রজন্ম লজ্জা বা সম্মান বোধকে আমলই দিতে চায় না, উপদেশ তো একেবারেই পছন্দের নয়। এই প্রজন্মের জন্য পুস্তকের বদলে **instagram**-এ রিল এবং সোশ্যাল মিডিয়া মুখ্য হয়ে গেছে। কিছু পড়তে হলে তো এদের লাইব্রেরি হচ্ছে মোবাইল ফোন কিংবা ল্যাপটপ। পারস্পরিক পুস্তক কিংবা বই ওদের জন্য যেন এলিয়ানের বিষয় হয়ে গেছে।

জেন-জি এর আজাদ ঘেয়াল নিজের জায়গায় ঠিক হতে পারে, কিন্তু দিল্লির প্রদর্শনে যে ধরনের ভাষা তারা ব্যবহার করেছে, তাতে ওদের মা-বাবাও লজ্জা পাবেন। **NEET** বিরোধী আন্দোলনে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে', '৩৭০ ধারার পুনর্বহাল' এ সবের কি কাজ ভাবা দরকার। এই আন্দোলনে বিশেষ করে মহিলারা যে ধরনের বেশভূষা পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ওঁনার স্বর্গীয় মা-কে যে ভাষায় গালাগালি দিয়েছে, তা কোনভাবেই বাক্ স্বাধীনতার নামে বরদাস্ত করা যায় না। ওরা বলেছে, 'ভারতকে যারা মা বলেন, তাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার তবে তাদের বাবা কে?' এই ধরনের অবিবেচক কথা যারা বলে, তারা কোন মতেই দেশভক্ত হতে পারে না। তারা বাস্তবে দেশদ্রোহী। ব্যক্তিগতভাবে যে কোন মানুষ নরেন্দ্র মোদিজিকে পছন্দ না করতে পারেন, কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গালাগালি দেওয়ার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? এটিকে আইনের কিংবা নৈতিকতার আড়াল করা সম্ভব নয়। এই বিষয় সহ্যের বাইরে।

দিল্লির পুলিশ ভিডিও এবং ফটোগ্রাফির দ্বারা ১০১ জন এমন আন্দোলনকারীকে চিহ্নিত করেছেন, যাদের উপর হত্যার মামলা আছ। ২৮৪ জনের বেশি ডাকাতি কিংবা ছিনতাইয়ের জন্য দোষী এবং ৯২ জনের উপর যৌন নির্যাতনের কেস আছে। পুলিশ মোট ২৮৭৩ জনকে চিহ্নিত করেছে, যাদের উপরে পুলিশকে হামলা করা এবং হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ পুলিশের রেকর্ডে আছে। এদের মধ্যে ৯৮৯ জনের উপর গভীর অপরাধের কেস আছে। মোটের উপর ছাত্র আন্দোলনে আড়ালে বড় কোন ষড়যন্ত্র ছিল বলে গোয়েন্দা বিভাগ সরকারকে জানিয়েছিল। তাই এই আন্দোলনকে সমাপ্ত করার জন্যই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ গ্রহণ করা হয়েছে। মোদি সরকারের এই পদক্ষেপ আন্দোলনের আগুনে জল ঢেলে দিয়েছে, ফলে বিরোধী দল এবং বিদেশি এজেন্সিরা হতাশ হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে দেশ সবথেকে আগে, পার্টি কিংবা ব্যক্তিগত ছবির কোন স্থান নেই।

শ্রীরাম জন্মভূমির উপর ভব্য মন্দির নির্মাণের জন্য হিন্দু সমাজ দীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে সংগ্রাম করেছে। গত ৯ই নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিমকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে, কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি অটোনমাস ট্রাস্ট বানিয়ে তাদের হাতে বিবাদিত ভূমিকে রামলালার মন্দির বানানোর জন্য প্রদান করতে আদেশ দেয়। সমগ্র দেশ থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও রাম ভক্তরা তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। এই সংগৃহীত অর্থ থেকে ভব্য রামমন্দির নির্মাণ হয় এবং ২২শে জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হয়। তারপর থেকে লাখ লাখ মানুষ অযোধ্যায় এসে তাদের আরাধ্য দেবের দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছেন। তারা রামলালার উদ্দেশ্যে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। কিন্তু অর্জিত টাকা গুণবার সময় কিছু অসাধু ব্যক্তিরা সেখান থেকে টাকা চুরি করে। এই চুরির খবর পাওয়ার পরই ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানিয়ে, সরকারকে **SIT** গঠন করার অনুরোধ করা হয়। **SIT** প্রথম দফায় ৮ জন দোষীকে গ্রেফতার করেছে। **SIT** সম্পূর্ণ রিপোর্ট পেশ করার আগেই, বিভিন্ন বিরোধী দলগুলো বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা প্রচার শুরু করে দেয়। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সেকুল্যারিজম শব্দের আড়ালে প্রায়শই নেতারা স্বার্থ পূর্তির হাতিয়ার তৈরি করে নেয়। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি, বামপন্থীরা স্বাধীনতার পর থেকেই রাম জন্মভূমিকে, বাবরি মসজিদ বলত। মন্দিরের স্থানে হাসপাতাল কিংবা স্কুল খোলার কথা বলত, এমনকি কিছু কট্টরপন্থীরা এই স্থানের উপর টয়লেট খোলার কথাও বলেছে। রাম মন্দির মুক্তির আন্দোলনকে তারা সম্প্রদায়িক বলে হিন্দু সমাজের আস্থাকে বদনাম করতেও পিছুপা হতো না। বাবরি ঢাঁচা ধ্বংস হওয়ার পর, সেখানে যাতে রাম মন্দির নির্মাণ না হয়, তার জন্য আদালতে, মিডিয়াতে তারা যতটা সম্ভব প্রয়াস করেছিল। বাস্তবে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সংখ্যালঘুদের ভোট পাওয়া। রামমন্দির এবং প্রভু রামচন্দ্রের উপর তাদের কোন আস্থা ছিল না।

রাম মন্দিরের সমর্পিত অর্থের চুরিকে কোন মতে মেনে নেওয়া যায় না এবং দোষী ব্যক্তিদের কঠোরতম শাস্তি সকলেরই

কাম্য। আইন তার কাজ করবে এবং প্রতিটি দোষীকে শাস্তি অবশ্যই দেবে, কিন্তু বিরোধী দলগুলোর আইন আদালতের উপর আস্থা নেই। তাই তারা অনর্গল মিথ্যা দোষ লাগানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করে **SIT**-এর সামনে তুলে ধরেছে না। বাস্তবে বিরোধীদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিন্দু মন্দিরগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে রেখে রাজনৈতিক লাভ নেওয়া। ওদের সেকুল্যারিজম হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণার উপর নির্ভরশীল। অথচ রাম মন্দির হিন্দুদের মধ্যে নতুন উৎসাহ এবং একতার সঞ্চার করেছে, যা বিরোধীরা চায় না। রাম বিরোধীরা প্রয়াস করছে, যাতে হিন্দু সমাজ মথুরা কাশির মন্দির মুক্তির অভিযান থেকে বিমুখ হয়ে যাক। তাই তারা রাম মন্দিরের প্রতি আস্থাকে আঘাত করতে চাইছে। বাস্তবে বিরোধী দলগুলো রাম মন্দিরকে বদনাম করার আড়ালে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে জয়লাভ করতে চাইছে। সনাতনী মানুষ ওদের এই ষড়যন্ত্রকে বিফল করবে বলেই বিশ্বাস করি।

গত ২৭শে মে, ২০২৬ তামিললাড়ুর মাদ্রাজ হাইকোর্ট একটি জনহিত মামলার শুনানির সময় আদেশ দেয় যে, রাজ্যে গরু এবং বাছুরের হত্যা করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হোক। কিন্তু শাসক দল এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে খুশি করার জন্য ওই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করেছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ঐ রায় তামিলনাড়ুর পশু সংরক্ষণ অধিনিয়ম ১৯৫৮-এর বিরোধী। সেখানে ১০ বছরের বেশি বয়স্ক গরু এবং অযোগ্য পশুদেরকে বধ করার বিধান আছে। সুতরাং মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রদত্ত আদেশ আইন অনুযায়ী নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ৮৪% অধিক জায়গায় (যেমন—দিল্লি, গুজরাট, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ) গরু, বাছুর, বলদ ইত্যাদি হত্যা করা আইন বিরুদ্ধ। যদিও অনেক রাজ্যে আংশিকভাবে এই আইন বলবৎ আছে। ১০ বছরের অধিক কিংবা অযোগ্য পশুকে বধ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষে। এই প্রমাণ প্রাণীবিকাশ মন্ত্রকের থেকে পাওয়া দরকার। কিন্তু বাস্তবে কতটা তা করা হয়, ভাবা দরকার। বিশেষ ধর্মের মানুষকে খুশি করার জন্য এই আদেশ ঠিকমতো পালনই করা হয় না। দেশে প্রায় ৪ কোটি গোবংশকে প্রতিবছর হত্যা করা হয়। এইভাবে চলতে থাকলে, একদিন গোবংশ ইতিহাসের বিষয় হয়ে যাবে। আদালতকে এই তথ্য সংগ্রহ করে কঠোরভাবে গোবংশ হত্যাকে রোধ করা উচিত। হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত গো-শালাকে শুধুমাত্র গরুদের আশ্রয়স্থল না ভেবে, সংরক্ষণস্থল বানানো দরকার। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গো-তস্করী এবং গো-হত্যা বন্ধ করার কাজ করে চলেছে। এই কাজে আমাদের অংশীদার হওয়া উচিত।

ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমায় ৫০ কিলোমিটার এলাকায় যে কোন অবৈধ মসজিদ, মাদ্রাসা, দরগাহকে হটানোর নির্দেশ দিয়েছে রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসমীর জৈন। জয়সালমীরের রামগড় স্থিত পীরমোহাম্মদ শাহ জিলানীর দরগাহ সমিতির আবেদনকে লিডকেস বানিয়ে, এই রায় প্রদান করা হয়েছে। শ্রীসমীর জৈন কবিতার ছলে বলেছেন, 'না মন্দির, না মসজিদ, না কোই দিওয়ার বড়ি হোতি হ্যায়, যব মাতৃভূমি কি রক্ষা কি ঘড়ি হোতি হ্যায়'। যে ভূমি রাষ্ট্রের, তা প্রথমে রাষ্ট্রের, সুরক্ষার প্রশ্নে রাষ্ট্রই প্রধান।

ভারতবর্ষে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল মুম্বাই থেকে থানে কয়লার ইঞ্জিন দ্বারা প্রথম রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয়। প্রায় ১০০ বছর কয়লার বাস্প ইঞ্জিন রেল চলাচলকে বজায় রেখেছিল। এই কয়লার জন্য পরিবেশ দূষণ হত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লার ভান্ডার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে রেলের গতি বৃদ্ধি পায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও দৃঢ় হয়। ক্রমাগত রেল যাতায়াত বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিদেশ থেকে ডিজেলের আমদানিও বৃদ্ধি পায়। কয়লার ইঞ্জিন থেকে দূষণ কম হলেও, এই ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহারের ফলে কার্বন উৎসরণ বৃদ্ধি পায়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় রেল ইলেকট্রিক চালিত ট্রেন চালানোর সূচনা করে। প্রথম বিদ্যুৎ ইঞ্জিন মুম্বাই-এর শিবাজী টার্মিনাল থেকে কুর্লার মধ্যে চলাচল শুরু করে। তারপর ধীরগতিতে রেল সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকরণের পথে এগোয়।

কিন্তু ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি সরকার আসার পর, দ্রুতগতিতে রেলপথকে পৃথিবীর সব থেকে বড় বৈদ্যুতিকরণের নেটওয়ার্কে সামিল করা হয়েছে। রেলপথ এবং রেল ইঞ্জিন সম্পূর্ণভাবে বৈদ্যুতিকরণ হওয়ার ফলে দূষণ শেষ হয়েছে এবং গতি তীব্র হয়েছে। গত ১৭ জুলাই, ২০২৬, শুক্রবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি হাইড্রোজেন শক্তি পরিচালিত ফুয়েল সেল ট্রেনের উদঘাটন করেছেন। এর ইঞ্জিনের ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বিদ্যুৎ তৈরি হয় এবং যা মোটরকে চালায়। ভারতে প্রথম হাইড্রোজেন টেন হরিয়ানার জিন্দ সোনিপত রেল মার্গে চলেছে। যে স্থানে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালানো সম্ভব হবে না, সেই সকল স্থানে এই ট্রেন চলবে। এই ট্রেনের ফলে কোনরকম পরিবেশ দূষণ হবে না। জার্মান, ফ্রান্স এবং চীনের পর ভারতবর্ষ চতুর্থ দেশ, যেখানে হাইড্রোজেন গ্যাসের দ্বারা ট্রেন চলাচল করছে। ভারতীয় রেলের ইতিহাসে এটি কেবলমাত্র ইঞ্জিন বদলের কাহিনিই তা নয়, বরং ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আত্মনির্ভরতাকে দৃঢ় করেছে। ভারতবাসী হিসেবে আমরা গর্ববোধ করছি।

## আগামী দুই সংখ্যার বিষয়

আশ্বিন ১৪৩৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৬) : রাখি পূর্ণিমা, গণেশ পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, বামন অবতার প্রকট উৎসব, বরাহ অবতার আবির্ভাব দিবস, বিদ্যাসাগর জন্ম দিবস, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জন্মজয়ন্তী, গান্ধী জয়ন্তী, অশোক সিংহলজি জন্মশতবর্ষ পালন বিবিধ।

কার্তিক ১৪৩৩ (অক্টোবর ২০২৬) : দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, আর.এস.এস-এর প্রতিষ্ঠা দিবস, ধনতেরাস, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা বাল্মিকী জয়ন্তী বিবিধ।

# বিশ্ব হিন্দু বার্তা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ ওঁ ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

কার্যালয় : ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪, দূরভাষ : ২৫৫৫-৩৫৮৯

প্রচার কার্যালয় : ১৭বি, নলিন সরকার স্ট্রিট, খান্না মোড়, কলকাতা-৪

দিলীপকুমার ঝাঁওর : ৯৯৩৩১৫০০৩৭, ড. জয়ন্ত বিশ্বাস : ৭৮৭২১৬৪৬৪৬

pnb SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP

9038149815m@pnb

MERCHANT: VISHVA HINDU VARTA

৫২তম বর্ষ ❋ প্রথম সংখ্যা ❋ ভাদ্র, ১৪৩৩ (আগস্ট, ২০২৬)



## ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র পরিচালন মণ্ডলী

- সভাপতি : শ্রীদিলীপ কুমার ঝাঁওর
- সহ-সভাপতি
  শ্রীজয়দেব সাহা (সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
  শ্রীতরুণকুমার লায়েক (সম্পাদক, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
  শ্রীলক্ষ্মণ বনসল (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
  শ্রীশঙ্কর রায় (সম্পাদক, ত্রিপুরা প্রান্ত)
- সম্পাদক : অধ্যাপক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস
- সহ-সম্পাদক
  শ্রীসৌগত বসু, সুশ্রী পারমিতা পাল
- প্রচার প্রসার প্রমুখ
  শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক
- পৃষ্ঠপোষক
  শ্রীপ্রশান্ত সিংহানিয়া
  শ্রীনিবেদন চুড়ীওয়াল
- সহ-প্রচার প্রসার প্রমুখ
  শ্রীচন্দন গুপ্তা (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
  শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জি (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
  শ্রীশ্রীকান্ত ঘোষ (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
  শ্রীঅমলকান্তি দাশ (ত্রিপুরা প্রান্ত)
- সদস্য : শ্রীপীতারুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চৌধুরী, শ্রীঅর্ণব দে, শ্রীশুভজিৎ দাস


## সূ চি প ত্র


সম্পাদকীয় ১
শ্রীকৃষ্ণ মহিলাদের সম্মান রক্ষার শিক্ষা দিয়েছিলেন —পারমিতা পাল ৪
গুরু পূর্ণিমা—আলপনা ঘোষাল ৬
গুরু পূজন উৎসব—মনোজ শা ৮
পদ্মা কাহিনি : দেবী মাতা মনসার রূপ, ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা—তমাল ভট্টাচার্য ২১
লৌকিক দেবী মা মনসা—সুপ্রিয় ঘোষ ২৩
ঐতিহ্য ও পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে সনাতন রথযাত্রা প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত—বিপ্লব চক্রবর্তী ২৫
১৪ই আগস্ট : বিভাজনের বেদনা ও ‘অখণ্ড ভারত’ দিবসের তাৎপর্য—পল্লব দে ২৭
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ —দিলীপ কুমার ঝাঁওর ২৯
ভারতীয় রাজনীতির উপর রাম জন্মভূমি মুক্তির আন্দোলনের প্রভাব—ড. জয়ন্ত বিশ্বাস ৩৩
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন —প্রোজ্জ্বল মণ্ডল ৩৬
হিন্দুত্বের স্বরূপ—সুধাংশুকুমার পাত্র ৩৮
কবিতা : শাপমোচন—সরোজ চক্রবর্তী ৩৯
কবিতা : শৌর্য জাগরণ যাত্রা—শর্মিষ্ঠা আচার্য্য ৩৯
আসুন আমরা হিন্দু হই—সংকলন : শ্রী এস. পি. শর্মা ৪০
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতি বৈঠক ৪৩
रामराज्य की पुनर्प्रतिष्ठा (आस्था, उत्तरदायित्व और व्यवस्था का सनातन प्रतिमान)—प्रशांत सिंघानिया ৫৮
मन्दिर का आध्यात्म एवं राजनीतिक आधार —अरुण चूड़ीवाल ৬৩



| প্রতি সংখ্যার মূল্য | বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা | দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক (১৫ বছর) | ডাক মাশুল |
|---|---|---|---|
| ১৫ টাকা | ১৮০ টাকা | ২৫০০ টাকা | নিঃশুল্ক |

বিশেষ ডাক ব্যবস্থায় ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র গ্রাহক শুল্ক বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার গ্রাহক হওয়ার জন্য নিচের দেওয়া ব্যাঙ্ক তথ্যে শুল্ক পাঠান এবং নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এই নম্বরে জানান : জয়ন্ত ভৌমিক : ৮৯৬১৭১২১০৬

**VISHVA HINDU VARTA**
Punjab National Bank A/c. No. : 1183010102690
IFSC Code : PUNB0118320, MICR : 700024325
Shyambazar Market Evening Branch



বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

| | |
|---|---|
| Back Cover Page | Rs. 50,000/- |
| Inside Front or Back Cover Page | Rs. 30,000/- |
| Inside Full Colour Page | Rs. 20,000/- |
| Colour Half Page | Rs. 10,000/- |
| Colour Quater Page | Rs. 5,000/- |

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
E-mail : advertisement.vishvahinduvarta@gmail.com


**চিঠিপত্র বিভাগ**

পত্রিকার লেখা সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে এই নম্বরে হোয়াট্‌অ্যাপ করুন ৭৮৭২৪৬১৬১৬


প্রকাশন বিভাগ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ
মুদ্রণ : আদিত্য গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং
RNI No. : 30136/1976


- লেখকদের প্রতি

১। প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।
২। পরিষদ সম্পর্কে বার্তা ছবি ও প্রতিবেদন e-mail কিংবা WhatsApp-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।
৩। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক বা প্রাবন্ধিকের, কর্তৃপক্ষের নয়।

# শ্রীকৃষ্ণ মহিলাদের সম্মান রক্ষার শিক্ষা দিয়েছিলেন

পারমিতা পাল

সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের প্রতিবছর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সনাতনীদের জন-নায়ক যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, জন্মাষ্টমী মহা ধুমধামের সহিত পালন করা হয়। প্রায় ৫২০০ বছর আগে মথুরার কংসের কারাগারে বাসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে অষ্টম বালক রূপে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ভাদ্র মাসের এক গহন অন্ধকারে রাত্রি ১২টায় শ্রীকৃষ্ণ জগতে আলো ছড়ানোর জন্য অবতার রূপে আসেন। আধ্যাত্মিক অর্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দের প্রতীক, সেই জন্য ওই দিন সনাতনী ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উৎসব পালন করেন অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে। মাতা দেবকী ভৌতিক শরীরে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা বাসুদেব গুরুত্বপূর্ণ জীবন শক্তি প্রাণের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই এই দুইয়ের মিলনে, যখন প্রাণ শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখনই আনন্দের (শ্রীকৃষ্ণে) জন্ম হয়। এই দিব্য আনন্দ, সদাই সর্বত্র বিরাজ করে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যাঁরা আমাকে সর্বত্র সবার মধ্যে এবং আমার মধ্যে সবাইকে দেখে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বুদ্ধিমান।' কিন্তু সেই সময় অহংকার রূপী দুষ্টু রাজা কংস, সেই আনন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণকে নষ্ট করতে চাইছিল। বাস্তবে সেখানে আনন্দ নিবাস করে, সেখানে অহংকার থাকতে পারে না। আবার প্রেম, খুশী, আনন্দ এবং স্বাভাবিকতা অহংকারের সব থেকে বড় শত্রু। কিন্তু এই আনন্দকে (শ্রীকৃষ্ণ) কংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সুরক্ষা হেতু বৃন্দাবনে মাতা যশোদা এবং নন্দ বাবার গৃহে নিয়ে যেতে হয়েছিল। শিশু অবস্থা থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে অহংকার রূপী রাক্ষসদের নিধন করতে হয়েছিল। এমনকি মামা কংসকেও বধ করতে হয়েছিল, আনন্দ এবং জনসুরক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র ভারতীয় ইতিহাসে নয়, বিশ্বের ইতিহাসে অলৌকিক এবং অদ্ভুত মানা হয়। সনাতনীদের সংস্কৃতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ অবতার মানা হয়, যিনি ১৬ কলাযুক্ত ছিলেন। ওঁনার ব্যক্তিত্বের বিবিধ বিশেষত্বের জন্য ওঁনাকে ভারতীয় সংস্কৃতির মহানায়ক রূপেই মান্যতা দেওয়া হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব জাতিকে সবসময় নিজের মর্যাদার মধ্যে থেকে সংঘর্ষ করার প্রেরণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর সর্বস্ব সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তিকেই আমি সব সময় উদ্ধার করে, সঠিক পথে চালিত করি।' ঠিক যেমনটা মহাভারতের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথী হয়ে পান্ডবদের বিজয় প্রদান করেছিলেন, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পান্ডবদের মাঠ দর্শন দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ গীতার জ্ঞানপ্রদান করেছেন, যা মানবজাতিকে সবরকম পরিস্থিতিতে ধৈর্যবান হতে শিখিয়েছে। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও সবসময় নির্লিপ্ত থেকে দৃঢ় হয়ে সবকিছু স্বীকার করার সহজ ভাব গ্রহণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নারী জাতির মান-সম্মান রক্ষার জন্য, সর্বদাই অগ্রণী থাকতেন। যেমন—

● শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুর নামক অসুরকে বধ করে, তার বন্দিগৃহ থেক, ১৬১০০ বন্দী মহিলাদের মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ওই বন্দী মহিলাদের সমাজ বহিষ্কৃত করে দেয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ ওঁদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্য, নিজেই ওঁদের রানীর মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। সেই মহিলারা দ্বারীকাতে থেকে সম্মানপূর্ণ জীবনযাপন করে, ঈশ্বর ভক্তি, ভজন-কীর্তন, সৎসঙ্গ করে সুখপূর্বক জীবন ব্যতীত করেছিলেন।

● শ্রীকৃষ্ণ নারীদের আত্মপক্ষকে শক্ত করার জন্যই, তাঁর বোন সুভদ্রাকে মন পছন্দের বর হিসাবে অর্জুনকে চয়ন করার উপায় বলে দিয়েছিলেন।

● রুক্মিণীর বিবাহ শিশু পালের সঙ্গে দেওয়ার প্রয়াস করেছিলেন তার ভাই রুক্মী। কিন্তু রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকেই পতি রূপে পেতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ওঁনার রক্ষা করার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণে রুক্মিণীর ইচ্ছাকে সম্মান দেওয়া জন্য সেখানে গিয়েছিলেন এবং রুক্মিণীকে স্ত্রী হিসেবে স্বীকার করেন।

● শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞসৈনী দ্রৌপদীকে সখি বলে মান্যতা প্রদান করেছিলেন। তাই ওঁনার বিভিন্ন বিপদের সময় বন্ধুত্বের কর্তব্য পালন করেছিলেন এবং দ্রৌপদীর মান সম্মানকে রক্ষা করেছিলেন। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালকে বধ করেছিল, তখন ওঁনার আঙ্গুল কেটে রক্তপাত হয়েছিল।

তখন দ্রৌপদী তাঁর নিজের শাড়ি ছিঁড়ে, শ্রীকৃষ্ণের আঙুল বেঁধে দিয়ে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করেন। দ্রৌপদীর এই প্রয়াসের বদলে, তিনি তাঁকে চরম বিপদে রক্ষা করার আশীর্বাদ দেন। দ্রৌপদীর ওই পুণ্যফলের কারণে দুর্যোধনের রাজসভায় চিরহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে এত বড় শাড়ি প্রদান করেন, যে দুঃশাসন দ্রৌপদীর চিরহরণ করতে অসমর্থ হন। কৌরব সভায় এক অসহায় নারীর সম্মান রক্ষিত হয়।

● অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে অভিমন্যুর স্ত্রী, উত্তরার গর্ভকে বাঁচান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

● মহাভারতের যুদ্ধের শেষে মাতা গান্ধারীর যদু বংশ ধ্বংসের অভিশাপকেও মেনে নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং নারীর ক্রোধ এবং অভিমানকেও সমান সম্মান প্রদান করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলাকে বিদ্বান, ঋষি-মুনিরাও সম্পূর্ণরূপে বুঝতে অসমর্থ। কিন্তু গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ গোপিনীরা, গরু-বাছুর তাঁর দিব্যতার সুখ খুব সহজেই অনুভব করতেন। তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ মাখন চোর, নটখট, কানাইয়া, রাসরচৈয়া, নন্দকিশোর ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের মন মোহহকতা আজও মানুষকে বিভর করে রেখেছে। তাই আজও কোন মাতা তাঁর বালকের তুলনা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে করে এবং বালিকাদের তুলনা মালক্ষ্মীর সঙ্গে করে থাকেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ‘আমি সেবকদের সেবক। নিজের সম্পূর্ণ চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, আমার প্রতি সমর্পিত হও। আমি তোমাদের সব পাপ মুক্ত করে, শুদ্ধ করে দেবো’। ‘শ্রীকৃষ্ণ শরণম মমঃ।’ ■

**বিশ্ব হিন্দু বার্তার পাঠক সম্মেলন, গড়বেতা, মেদিনীপুর জেলা, দক্ষিণবঙ্গ**

**সৎসঙ্গ, বরাহনগর, উত্তর কলকাতা জেলা, দক্ষিণবঙ্গ**

**রথযাত্রা, মাদপুর প্রখণ্ড, মেদিনীপুর জেলা, দক্ষিণবঙ্গ**

# গুরু পূর্ণিমা

## আলপনা ঘোষাল

হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে আষাঢ় মাস ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আষাঢ় মাসে পালিত হয় যোগিনী একাদশী, দেব শয়ানী একাদশী, রথযাত্রার অনুষ্ঠান, মা বিপত্তারিণী পূজা ও অম্বুবাচি। এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয়। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম, এই দুই ধর্মেই গুরু পূর্ণিমা বিশেষ মহাত্ম্যপূর্ণ, এমনকি জৈন ধর্মেও এর গুরুত্ব রয়েছে। তবে জৈন ধর্মে এটি 'টেনোক গুহ পূর্ণিমা' হিসেবে পালন করা হয়। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে এই তিথিতে মুনি পরাশর এবং সত্যবতীর ঘরে 'মহাভারত' রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই এই দিনটিতে বেদব্যাসের জন্মতিথি হিসাবে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। এই কারণেই গুরু পূর্ণিমা বা আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে 'ব্যাস পূর্ণিমা' বলা হয়ে থাকে। মহর্ষি বেদব্যাস চতুর্বেদের সম্পাদনা পরিমার্জনা করেছিলেন। ১৮টি পুরাণ ছাড়াও রচনা করেছেন 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা' এবং 'মহাভারত'। বেদব্যাসকে অনেকে ভগবান বিষ্ণুর অংশ ও অবতার মনে করেন, তাই গুরু পূর্ণিমার দিন ভগবান বিষ্ণুরও বিশেষভাবে পূজা করা হয়। মনে করা হয়, গুরু পূর্ণিমার দিন বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর পূজা করলে অর্থ প্রাপ্তি, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য লাভ হয়।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে মহাদেব হল আদিগুরু, তাঁর প্রথম শিষ্য ছিল ব্রহ্মার মানসপুত্র সপ্তর্ষি অর্থাৎ সাতজন ঋষি। তারা হলেন—অত্রি, বৈশিষ্ঠ্য, পুলহ, পুলস্থ, অঙ্গিরা, মরিচি এবং কেতু। যদিও কেতু নাম নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে আদিযোগী শিব এই তিথিতে আদিগুরুতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। সাত ঋষিকে মহা জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তাই এই তিথি হল 'গুরু পূর্ণিমা'। গুরু পূর্ণিমার আরও একটি তাৎপর্য হল, জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে গুরু পূর্ণিমা বৃহস্পতি গ্রহের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা দেবতাদের শিক্ষক গুরু হিসেবে পূজিত হন।

গুরু পূর্ণিমা অত্যন্ত প্রাচীন একটি সনাতনী বৈদিক প্রথা, যার মাধ্যমে শিষ্য তাঁর গুরুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। প্রাচীন আর্য সমাজে শিক্ষক এবং গুরুর স্থান কতটা শ্রদ্ধার তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ সেই সময় থেকে শিষ্য আর গুরু কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক, সেই অনুভূতিকে জাগ্রত করতে বৈদিক যুগ থেকেই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি আজও বিশেষভাবে পালিত। তবে আমাদের জীবনে বাবা-মায়ের থেকে বড় গুরু আর কেউ হয় না।

গুরু পূর্ণিমা একট অত্যন্ত পবিত্র দিন। হিন্দু পঞ্জিকা মতে যা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গুরু বা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পালিত হয়। 'গুরু' শব্দটি 'গু' এবং 'রু' এই দুটি সংস্কৃত শব্দ দ্বারা গঠিত, 'গু' শব্দের অর্থ হল অন্ধকার বা অজ্ঞানতা এবং 'রু' শব্দের অর্থ হল অন্ধকারকে দূরীভূত করে, অর্থাৎ গুরু শব্দের অর্থ হল, যিনি অন্ধকার বা অজ্ঞানতাকে থেকে আলোর পথপ্রদর্শক এবং জ্ঞানের পথে নিয়ে যান। পূর্ণিমা মানে পূর্ণচন্দ্র, শিষ্যের জীবনে গুরুর দেওয়া জ্ঞানের আলোয় পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রতীক হল গুরু পূর্ণিমা।

শুধু হিন্দু ধর্মেই নয়, বৌদ্ধ ধর্মেও এই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। কারণ বোধি জ্ঞান লাভের পর গৌতম বুদ্ধ এই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতেই সারনাথে তাঁর প্রথম উপদেশ এবং ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। জানা যায়, এই তিথিতে তিনি তাঁর পুরনো পাঁচ জন সঙ্গীকে প্রথমবার তাঁর বাণী প্রদান করেছিলেন। শিষ্যগণ ও বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই গুরুর স্থানে বিরাজিত হয়েছিলেন 'গৌতম বুদ্ধ'।

আমাদের হিন্দু ধর্মে আষাঢ়ী পূর্ণিমা, গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমার একটি তাৎপর্য আছে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মাবলম্বীদের এই গুরু পূর্ণিমার মাধ্যমে শুরু হয় চতুর্মার্শ। আষাঢ় মাস থেকে শুরু করে বর্ষাকা, 'বর্ষাবাস' নামে পরিচিত। এই পূর্ণিমার মাধ্যমে সারা ভারতে শুরু হয় বর্ষা, এমনটাই বিশ্বাস। এই সময় বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মে দীক্ষিত নবীন এবং প্রবীণ সমস্ত শ্রবণেরা এক জায়গায় জড়ো হন এবং তারা শুরু করেন ১৬ সপ্তাহের পাঠ গ্রহণ সূচী। তারা জনপথ ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গুহায় বা মঠে গিয়ে চার মাস ধর্মনিষ্ঠার পর্ব শুরু করে। জৈনরা বিশ্বাস

করেন এই দিনে গান্ধারী গৌতমস্বামীকে মহাবীর তাঁর প্রথম শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষা দেন। এই চারমাস আত্ম সংযমের সময় বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মাবলম্বীরা খাবারের কিছু নিয়ম পালন করেন। তারা আমিষ আহার গ্রহণ করেন না। সিংহলিরা তখন তাদের ক্যালেন্ডার অনুসারে যখন বর্ষা আসে 'বর্ষাবাস' নামে এই উৎসব পালন করেন। থাইল্যান্ডের বৌদ্ধরাও একে পালন করেন, জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বেশ অনুগতভাবে। ভিয়েতনাম, তিব্বত, কোরিয়া এবং বেশ কিছু বৌদ্ধ গোষ্ঠী এই সময় তারা অন্যত্র কোথাও যায় না। দেব সায়নী একাদশী থেকে শুরু করে চতুর্মার্শ।

এই দিনটি নেপালিদের জন্য 'শিক্ষক দিবস'। বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষকদের সম্মান জানায় এবং উপাদেয় খাবার, মালা এবং দেশীয় কাপড় দিয়ে তৈরি 'টুপি' শিক্ষকদের উপহার দেওয়া হয়।

ধর্মবিশেষে ভারতীয় শিক্ষাবিদরা তাঁদের শিক্ষকদের সম্মান জানিয়ে এই দিনটিকে উদযাপন করেন। অনেক স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা তাঁদের শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানায় এবং অতীতের পণ্ডিতদের স্মরণ করে এবং কৃতজ্ঞতা হিসেবে উপহারও দিয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীরা সেই অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রধান ঐতিহ্য হল আশীর্বাদ, অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রী তার শিক্ষক বা গুরুকে অভিবাদন জানায় এবং শিক্ষক একজন ব্যক্তির সাফল্য ও সুখের জন্য আশীর্বাদ করেন। এই আষাঢ়ী গুরুপূর্ণিমা হল ভারতীয়দের শিক্ষক দিবস উদযাপনের একটি ঐতিহ্যবাহী উপায়।

গুরুপূর্ণিমা ধর্মীয় মান্যতা হিসেবে অত্যন্ত শুভ একটি দিন। এই উৎসব ঐতিহ্যগতভাবে একজনের আধ্যাত্মিক গুরু বা শিক্ষককে উৎসর্গীকৃত। এই দিনটিকে সাধক বা ভক্তরা তাঁদের নিজ নিজ গুরুর পায়ে পূজা এবং ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ, গুরুর প্রদত্ত মন্ত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জ্ঞান অর্জনের জপ ও ভজনের মাধ্যমে এই দিনটিকে পালন করে থাকেন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এই পূর্ণিমায় গুরুর পূজা অর্চনা করলে অক্ষয় আশীর্বাদ মেলে।

এই পূর্ণিমার আরো একটি বিশেষত্ব হল, এই দিন শিব এবং পার্বতীর মুরুগান এবং দেবনাগর এবং বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর মতো কিছু দেবতাদের দিব্য বিবাহ স্মরণ করা হয়। এই দিনে আরাপ্পানের আবির্ভাবও ঘটেছিল। এই দিনে অনেক ভক্ত এবং সাধকরা ভগবান বিষ্ণু এবং শিবের পূজা করে থাকেন। শেষে আমিও আমার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে বলি—

''অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।" ■

পরিষদ বার্তা

## ব্যারাকপুর জেলার খড়দহে ও উত্তর দমদমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে রথযাত্রা উৎসব

সনাতন সংস্কৃতির চিরন্তন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে গত ১৬ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ অবধি ৯ দিনব্যাপী রথযাত্রা উৎসব পালিত হয় খড়দহ নগরে ও উত্তর দমদমে। উত্তর দমদমে ১৬ তারিখ রথ যাত্রা ও ২৪ তারিখ উল্টো রথযাত্রায় অসংখ্য সনাতনীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সমগ্র পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে। এছাড়াও সাত দিনব্যাপী চলে ধর্মীয় সম্মেলন। নাম কীর্তন, সৎসঙ্গ, ভক্তিগীতি, বাউল গান ও খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি সংগীত পরিবেশনা করেন ব্যারাকপুর জেলা সম্পাদক শ্রীপিনাকী চ্যাটার্জী মহাশয়। এই প্রসঙ্গে উত্তর দমদম প্রখণ্ডের সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস বলেন এই মহোৎসব সনাতন ধর্মের ঐক্য সেবা ভক্তি ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আগামী দিনে সমাজের আরো বেশি সংখ্যক মানুষকে যুক্ত করে এই রথযাত্রা উৎসব কি করে আরও বড় আকারে করা যায় সেই লক্ষ্য থাকবে। মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের এই রথযাত্রা সমগ্র হিন্দু সমাজকে শিক্ষা দেয় যে, প্রেম, ভক্তি, শিক্ষা, সেবা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শেই গড়ে ওঠে সুসংগঠিত সমাজ ও শক্তিশালী জাতি। তাই এই মহোৎসবকে সামনে রেখে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নিজেদের নিবেদিত করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

# গুরু পূজন উৎসব

## মনোজ শা

গুরু পূর্ণিমা ভারতীয় সংস্কৃতির এক অত্যন্ত পবিত্র অঙ্গ। এই উৎসব গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের দিন। যিনি ব্যক্তিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে জানা। এই দিন সমর্পণের দিন, শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের দিন। শিষ্যের সমর্পণ আধ্যাত্মিক জীবনের সৌভাগ্যের শিখর, বড়ই পূণ্যবান সেই ব্যক্তি যার মনে শীর্ষত্ব অঙ্কুরিত হয়, এই অঙ্কুরণ সহজ নয়, অনেক দান, ব্রত এবং অগণিত শুভ কাজের ফলস্বরূপ হৃদয় এত উর্বর হয় যে তাতে শীর্ষত্ব অঙ্কুরিত হতে পারে। এই অদ্ভুত অঙ্কুরণকে খুব যত্ন সহকারে পালন করতে হয়। একদিকে সাংসারিক আকর্ষণ অন্যদিকে আধ্যাত্মিক কঠোর অনুশাসন। সবকিছু ভুলে গুরুর প্রতি পূর্ণ সমর্পণ না হলে প্রকৃত শিষ্য হওয়া যায় না। সদগুরুর শ্রীচরণে শিষ্যের নিঃস্বার্থ সমর্পণ শিষ্যর মার্গ দর্শন করে, ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করে।

আমাদের দেশে গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক অবিরল ধারা অনাদিকাল থেকে বয়ে চলেছে। এখানে সফলতা শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, নম্রতা, নৈতিকতা এবং চরিত্রের বিকাশ এবং ভেদাভেদ হীন এক সমাজব্যবস্থাই হল গুরুকুলের মূল উদ্দেশ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তার শিষ্য বিবেকানন্দের মনে ভগবান এবং ধর্ম সম্পর্কে যে সন্দেহ ছিল তার নীরসন করার পর 'নরেন' স্বামী বিবেকানন্দ হতে পেরেছিলেন। আচার্য চাণক্য এক সাধারণ বালককে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন, মহর্ষি সন্দীপনের আশ্রমে যদুকুল পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অতি দরিদ্র সুদামা একই সঙ্গে শিক্ষা লাভ, ভেদাভেদ হীন এক সমাজব্যবস্থার পরিচায়ক। একাগ্রতার প্রশ্ন উঠলে গুরু দ্রোণাচার্য এবং অর্জুনের উদাহরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। শিবাজীর গুরু রামদাস, শিবাজীকে রাষ্ট্রধর্ম রক্ষার্থে সর্বস্ব ত্যাগে অনুপ্রাণিত করেন, শিবাজী তাঁর রাজ্য গুরুর শ্রীচরণে উৎসর্গ করেন এবং গুরুর আদেশ অনুসারে প্রশাসক হিসাবে রাজ্য পালনে ব্রতিহন।

সনাতন পরম্পরায় এবং ভারতীয় রাষ্ট্রবোধে এক বিশেষ এবং প্রগতিশীল পরম্পরার ও চল রয়েছে, সেটা হলো গেরুয়া ধজ অর্থাৎ গেরুয়া পতাকাকে নিজের গুরুর স্থানে বসানো। এর পিছনের দর্শন অত্যন্ত গভীর, ব্যবহারিক এবং দূরদর্শী, ব্যক্তিপূজোর উপরে উঠে বিচারধারার 'পুজো'। মানুষ ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে, ব্যক্তির পতন যেকোনো অবস্থায় হতে পারে। সময়ের সাথে ব্যক্তির বিচারের পরিবর্তন হতে পারে, গুরুপূজন অনেক সময় ব্যক্তি পুজোয় পরিণত হয়। অন্যদিকে গেরুয়া পতাকার পূজা অর্থাৎ এক বিচার, এক ব্যবস্থার প্রতীক-এর পতন সম্ভব নয়। এর কোনরূপ সাংসারিক মোহ মায়ায় আবদ্ধ হবার কোন আশঙ্কা নেই।

গেরুয়া রং ভারতীয়তার প্রতীক, এই রং অনাদিকাল থেকে আমাদের মুনি ঋষি, সন্তজনের ত্যাগ এবং তিতিক্ষার প্রতীক। গেরুয়া রং আগুনের লেলিহেন শিখার মত আমাদের অহংকার, স্বার্থ, দ্বেষ এবং বিভিন্ন বিকারকে ভস্মিভূত করে এবং সমাজ, দেশ এবং ধর্মের প্রতি সমর্পণের প্রেরণা দেয়। শিবাজীর হিন্দবী স্বরাজের প্রতীক ছিল গেরুয়া। মহারানা প্রতাপ, মহারাজা রঞ্জিত সিংহ থেকে শুরু করে রানা সাজ্ঞা, চোল সাম্রাজ্য সবার প্রতীক ছিল গেরুয়া পতাকা। প্রতিটি ভারতীয়র শিরা-উপশিরায় গেরুয়া রং সঞ্জীবনী ওযুধের মতো প্রবাহিত আধুনিক 'কালার থেরাপি' অনুসারে গেরুয়া রং সমৃদ্ধি এবং আনন্দের প্রতীক এই রং মানসিক এবং শারীরিক উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ রূপে সহায়ক। ত্যাগ, সমর্পণ এবং সেবার এই প্রতীক অনন্তকাল হতে আমাদের পথপ্রদর্শক। গেরুয়া পতাকা হিন্দু সমাজের ক্রমাগত সংঘর্ষ এবং বিজয়ের সাক্ষী।

সংস্কৃতি যেকোনো দেশের জীবনী-শক্তি আর গৈরিক পতাকা হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক, তাই এই দিন আমরা রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা স্মরণ করি এবং সংকল্প করি এই পতাকার সম্মান রক্ষার্থে সদা তৎপর থাকবো।

### শোকবার্তা

গত ৪ঠা আগস্ট মঙ্গলবার কলকাতার কসবা জেলার সৎসঙ্গপ্রমুখ শ্রীদেবজিৎ দাসের পিতা পরলোক গমন করেছেন। ওঁনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকগ্রস্ত পরিবারেরকে সান্তনা জানাই। ওঁম শান্তি, ওঁম শান্তি।

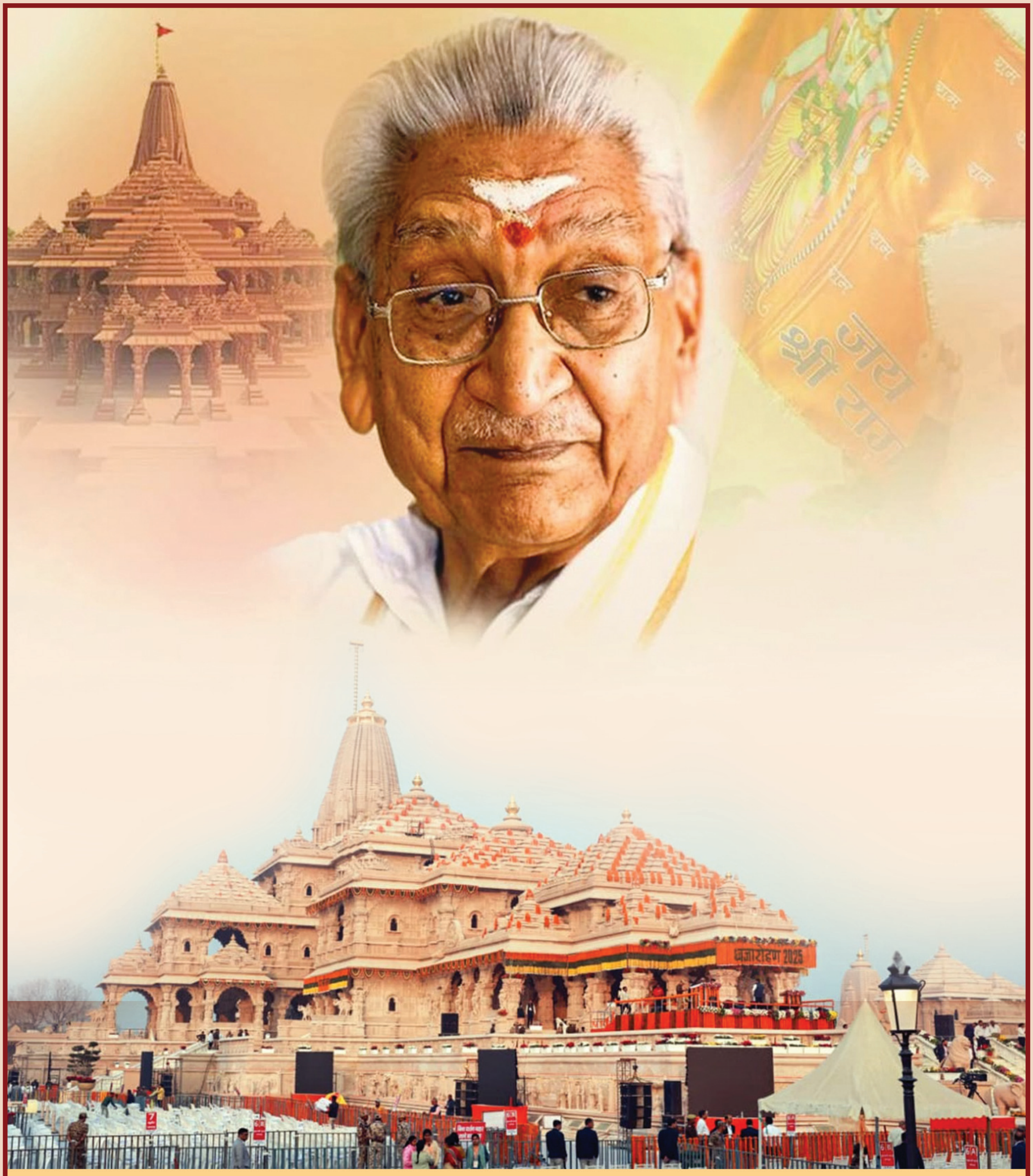

# জন্মশতবর্ষে শ্রীঅশোক সিংহলজী

[ ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ - ১৭ নভেম্বর, ২০১৫ ]

## ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’-র শ্রদ্ধাঞ্জলি

*With Best Compliments From :*

# WADHWANA

Development House
3rd Floor
24, Park Street, Kolkata-700016

Mobile
9874949489 / 9830023763

E-mail : wadhwana24@hotmail.com

With Best Compliments From **NARSARIA'S** of :

## *Ganapati Enterprises*

## *L. Vaibhav Castings Pvt. Ltd.*

Trimurti Tower, 7th Floor, 22, Hemanta Basu Sarani,
Kolkata - 700 001, Phone : +91 033 48011204
E-mail : ganapatienterprises@gmail.com / Lvcastings@gmail.com
Web : www.Lvcastings.in

**Deals in :**

Ductile Iron & Cast Iron Spun Pipe, Ductile Iron & Cast Iron Fittings & Specials, Ductile Iron & Cast Iron All types of Valves, Ductile Iron & Cast Iron Double Flange Pipes, Ductile Iron & Cast Iron Mechanical Joint Fittings, Centrifugally Cast Soil Pipe & Fittings— IS : 3989, Cast Iron Soil Pipe & Fittings – IS : 1729, G. I. Pipes & M.S. – ERW Pipes & Fittings, PVC & UPVC Pipes & Fittings, Tyton Rubber Gaskets

**CONTACT**

**Manish : 98310 21165 | Vikram : 98311 74450 | Gautam : 98311 10080**

# AVINANDAN

*on the Glorious 52 years of*
*'Vishva Hindu Varta'*

## SHRI UMESH RAI

Minister of State
Urban Development
&
Municipal Affairs and Parliamentary Affairs

*With Best Compliments From :*

## M/S. KUMAR DECORATOR AND CATERER

**707/1, Sonamukhi, P.O.-Hijli**
**Kharagpur Town**
**Dist-Paschim Medinipur**
**Pin-721306**

**Partner**
**PANKAJ KUMAR**

**Mobile : 8768875666/9933775377**
**E-mail : kdciitkgp@gmail.com**

***Best Wishes From***

**A**
**WELL**
**WISHER**

*With Best Compliments From :*

# Rajasthan Vidya Mandir

A CISCE, New Delhi affiliated School for Girl's with all well equipped laboratories providing Science, Commerce & Humanities Course from Lower KG to Class-XII and It is the 1st English Medium Girl's School in North Kolkata.

Founder Secretary **Atmaram Kajaria** managed & run by Rajasthan Chhatra Niwas Trust. 36, Baranashi Ghosh Street, Kolkata-700007.

## Rajasthan Vidya Mandir

**36, Baranashi Ghosh Street, Kolkata - 700 007**
**Phone : 033-79638314**

WISH YOU A
Happy
JANMASHTAMI
GO.DEN®
RESOURCES
Real fruit natural delight
GO.DEN
RESOURCES
CORPORATE GIFTING
LUXURY GIFTING
GIFT BOXES
FLAVOURED DRY FRUITS
CUSTOMISED ITEMS
Premium Quality
BEST SELECTION
Finest Dry Fruits
Happiest Moments
8100770707 | 8100770700
ADITYA JHAWAR
SOBHA JHAWAR

*With Best Compliments From :*

## BHAGAVATI IMPEXX
## SHREE MANGALAM UDYOG

*Deals in :*

Poultry/Cattle/Aqua feed Raw Materials
Rice Bran Oil | DORB | Rice Polish | Maize
Oil Cakes | Mustard DOC | Soya DOC | Broken rice

shreemangalamudyog@gmail.com

+91 9830304198 / 9874530090

187, Rabindra Sarani, Room No. 74, 2nd Floor, Kolkata - 700 007

*With Best Compliments from :*

**Sunil Jain**
**+91 9830024372**

## Rohit Tradelink Private Limited

123, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700073

Tel. : +91 33 2235-9706, 2235-9708
E-mail : rohittradelink@gmail.com

With best compliments from :

BSL Ltd. is one of India's leading and oldest textile mills based in Bhilwara, Rajasthan.

We manufacture PV & PW Suiting's alongwith a varied range of furnishing fabrics and a complete array of Synthetic, Worsted, Vortex and Cotton yarns.

Our products are exported to over 55 countries in the world.

*With Best Compliments From :*

**Kothari**®

A NAME FOR QUALITY HOSIERY PRODUCTS

**KOTHARI HOSIERY FACTORY PVT. LTD.**

29, STRAND ROAD, KOLKATA - 700 001
TEL : 2243 9371 / 73, FAX : 2243 3109
E-mail : skcc.cal@skcc.in.net ● Website : www.kotharihosy.com

**SALES OFFICE**

113, Manohardas Katra, Kolkata - 700 007
Tel : 2269 0270 / 2268 9904

**DELHI SALES DEPOT**

98, Narayan Market, Sadarbazar, Delhi - 6
Phone : 2263 4886, 2367 8237

## गौमाता को नमस्कार करने का मंत्र

नमो गोभ्यः श्रीमतोभ्यः सौरभेयोभ्य एव च।
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।।

यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमम्।
तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्।।

पञ्च गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ।
तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः।।

सर्वकामदुघे देवि सर्वतीर्थाभिषेचिनि।
पावनि सुरभिश्रेष्ठे देवि तुभ्यं नमो नमः।।

## वन्दे मातरम्

सुजलाम् सुफलाम् मलयज़शीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। १।।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। २।।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिर्णी नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिर्णी मातरम्। वन्दे मातरम्।। ३।।

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।
वन्दे मातरम्।। ४।।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अनुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।। ५।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। ६।।

*With Best Compliments From :*

BD GROUP

**1, Jogindar Kabiraj Road, 6th Floor**
**Kolkata-700007**

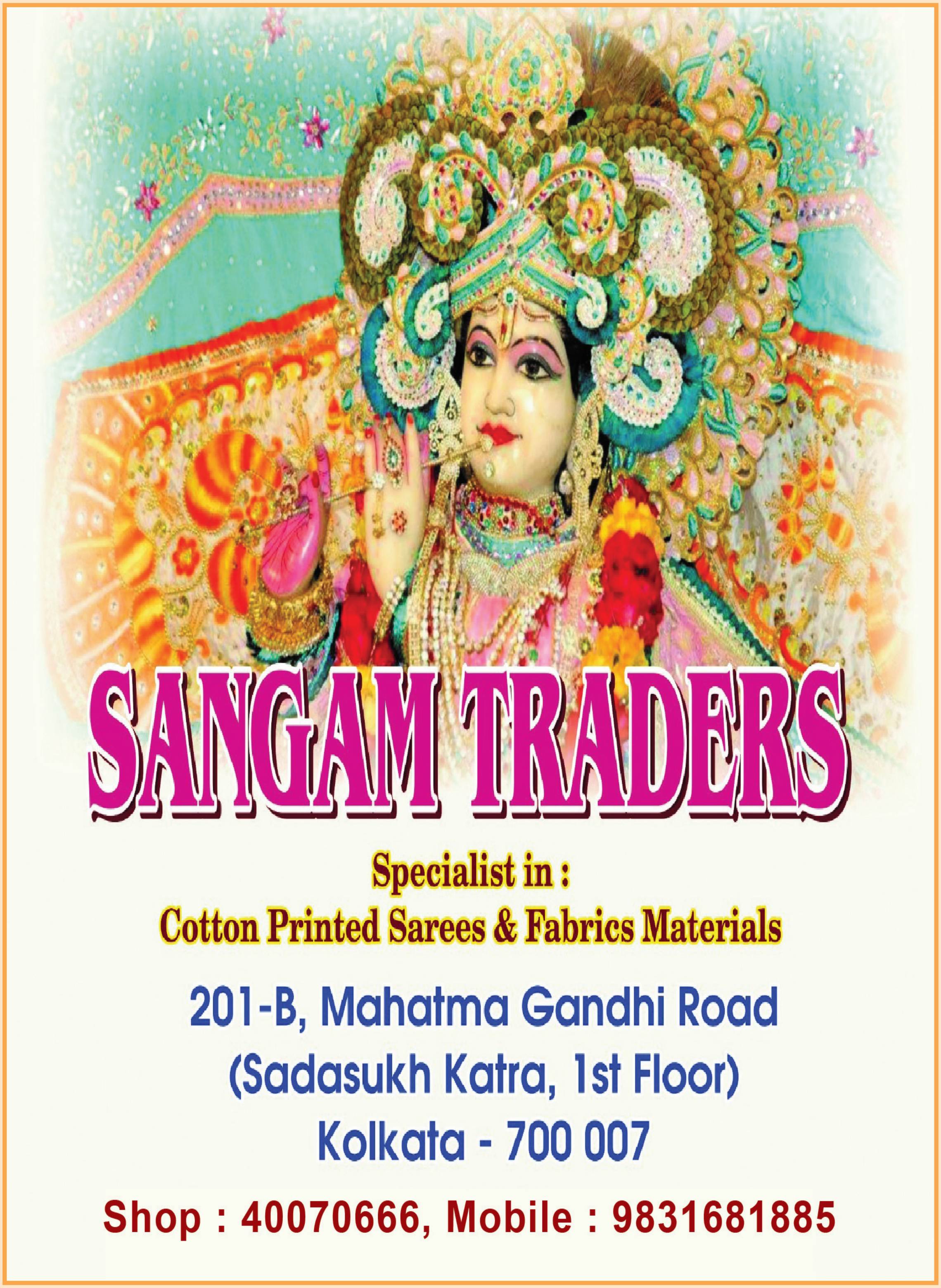
SANGAM TRADERS
Specialist in :
Cotton Printed Sarees & Fabrics Materials
201-B, Mahatma Gandhi Road
(Sadasukh Katra, 1st Floor)
Kolkata - 700 007
Shop : 40070666, Mobile : 9831681885

জাগো, তুমি জাগো...
জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী
অভয়াশক্তি বলপ্রদায়িনী তুমি জাগো।
জাগো, তুমি জাগো...

প্রণমি বরদা, অজরা অতুলা
প্রণমি বরদা, অজরা অতুলা
বহু-বলধারিণী রিপুদলবারিণী জাগো মা।
শরণময়ী চণ্ডিকা শংকরী জাগো,
জাগো মা,
জাগো অসুরবিনাশিনী তুমি জাগো।

জাগো, তুমি জাগো,
জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী
অভয়াশক্তি বলপ্রদায়িনী তুমি জাগো।
জাগো, তুমি জাগো...

**AVINANDAN**

on the Glorious 52 years of 'Vishva Hindu Varta'

....

**PROF. PARTHA SARATHI GHOSH**

**IIT KHARAGPUR**

JAMINI®
Jamini
Some values never go out of style.
In a world that moves fast, we believe in things that last— truth, kindness, hard work and respect.
These are not just ideals. They are choices we make everyday— in how we work, in what we create and in how we treat one another.
OUR PROMISE. OUR PRACTICE.
RESPECT FOR ALL
Every person. Every tradition. Every thread of life.
HONEST IN WORK
We believe in fair practices, true quality and transparency.
KIND TO EARTH
Conscious choices for a cleaner, greener tomorrow.
EMPOWERING PEOPLE
Supporting artisans, preserving heritage and strengthening families.
ROOTED IN OUR CULTURE
Inspired by our heritage. Designed for today. Cherished for years.
“ When we choose what is right, we build trust. When we live with care, we build a better world.
TOGETHER, LET'S KEEP THESE VALUES ALIVE
COMPASSION
Let's choose kindness in every thought, word and action.
INTEGRITY
Let's stand for truth, even when no one is watching.
RESPECT
Let's value our roots, our culture and every human being.
RESPONSIBILITY
Let's use resources wisely and give back to society.
UNITY
Let's grow together and rise together as one community.
Small choices. Strong values. Timeless impact.
Thank you to all our readers and well-wishers for being part of this journey.

# পদ্মা কাহিনি : দেবী মাতা মনসার রূপ, ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা

তমাল ভট্টাচার্য

**বা**ংলার লোকসংস্কৃতি, ধর্মীয় চেতনা ও সাহিত্যধারায় দেবী মনসা এক অনন্য ও বহুমাত্রিক দেবীসত্তা। তিনি কেবল সর্পদেবী নন; তিনি কৃষিজীবনের রক্ষাকর্ত্রী, পারিবারিক মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী, নারীশক্তির প্রতীক এবং বাংলার সামাজিক সম্প্রীতির এক জীবন্ত উত্তরাধিকার। পদ্মফুলের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের কারণে তিনি 'পদ্মা' বা 'পদ্মাবতী' নামেও পরিচিত।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, দেবী মনসা শিবের মানসকন্যা এবং নাগরাজ বাসুকির ভগিনী। মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে যে শিবের দিব্য তেজ পদ্মের উপর পতিত হলে সেখান থেকেই দেবীর আবির্ভাব ঘটে। বাসুকি তাঁকে স্নেহভরে ভগিনী হিসেবে গ্রহণ করেন। দেবীর প্রিয় ফুল পদ্ম ও রক্তজবা; শাস্ত্রীয় ধ্যানে তাঁকে রাজহংসবাহিনী, পদ্মাসনা ও অষ্টনাগবেষ্টিতা রূপে কল্পনা করা হয়।

দেবীর ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে—'ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং...' এবং প্রণাম মন্ত্রে তাঁকে 'আস্তিকস্য মুনের্মাতা' বলে বন্দনা করা হয়েছে। এই সম্বোধনের মধ্যেই তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত আছে—মাতৃত্ব। মায়ের বাহন হল রাজহংস।

নাগবংশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বাসুকি তাঁর ভগিনী মনসার বিবাহ দেন মহা তপস্বী ঋষি জরৎকারুর সঙ্গে। কিন্তু শর্তসাপেক্ষ সেই দাম্পত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সন্ধ্যা বন্দনার সময় ঘুমন্ত স্বামীকে জাগিয়ে দেওয়ায় ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করেন। তখন দেবী গর্ভবতী। স্বামীর প্রস্থান সত্ত্বেও তিনি একক মাতৃত্বের অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পুত্র আস্তিক মুনিকে লালন-পালন করেন। পরবর্তীকালে আস্তিক মুনি রাজা জনমেজয়ের ভয়ঙ্কর সর্পযজ্ঞ বন্ধ করে সমগ্র নাগবংশকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাই মনসা কেবল সর্পদেবী নন, তিনি জীবনরক্ষারও প্রতীক।

বাংলার লোকজ জীবনে দেবীর আর এক মহিমান্বিত রূপ দেখা যায় চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরের কাহিনিতে। চাঁদের অহংকার ভেঙে এবং বেহুলার অটল প্রেম ও ভক্তির দ্বারা মুগ্ধ হয়ে তিনি মৃত লক্ষ্মীন্দরকে পুনর্জীবন দান করেন। শুধু তাই নয়, চাঁদের হারানো ধনসম্পদ ও পুত্রদেরও ফিরিয়ে দেন। এই করুণাময়ী মাতৃরূপই তাঁকে 'জগৎগৌরী' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

গ্রামবাংলায় আজও সিজ বা মনসা গাছ, ঘট, দুধ-কলা ও ব্রতকথা পাঠের মাধ্যমে তাঁর পূজা হয়। লোকমুখে শোনা যায়—

"আঁস্তকুঁড়ো গেঁড়ো গেঁড়ো সিজ মনসার গাছ,
তাতে লোটে পদ্মাবতী নাচে তিতির মাছ।
এসো মা মনসা বসো ঘটে,
নজর রেখো মোদের ভিটে-পটে।"

একসময় বাংলার বহু অঞ্চলে মনসা গাছ, ঘট এবং পীরবাবার থানের সহাবস্থান দেখা যেত। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ লোকবিশ্বাসের ভিত্তিতে একসঙ্গে মানত করতেন, যা বাংলার বহুত্ববাদী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। আজও মনসা পূজা মানুষকে মনে করিয়ে দেয়; প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানই প্রকৃত মঙ্গল। পরবর্তীতে মুসলিম মৌলবাদীদের দাপটে এই সম্প্রীতি নষ্ট হয়।

মনসা পূজার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারীর ভূমিকা। গৃহিণীরাই সাধারণত ঘট স্থাপন, আলপনা অঙ্কন, ব্রতকথা পাঠ ও পূজার আয়োজন করতেন। বেহুলার চরিত্রে আমরা দেখি ধৈর্য্য, সংগ্রাম ও আত্মশক্তির এক অসামান্য প্রতীক, যা আজও নারীর ক্ষমতায়ণের অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ভাবধারায়ও মনসাতত্ত্ব এক গভীর অর্থ বহন করে। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন, মানুষের অন্তরের কাম, ক্রোধ ও হিংসার বিষকে জয় করাই প্রকৃত

মনসা উপাসনা। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও গ্রামীণ বাংলার বাস্তু-সাপ ও লোকবিশ্বাসের প্রতি সহজ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। মা মনসার গায়েত্রী মন্ত্র : ওঁ নবকুলায় বিদ্মহে বিষদন্তায় ধীমহি তন্নো সর্পঃ প্রচোদয়াৎ। মায়ের সাধনা সরল প্রাণে বিশ্বাসের সাথে যেমনি হয়, তেমনি গুরুমুখী গুহ্য সাধনও রয়েছে। ভক্তগণ হৃদয়ের ভাব উজাড় করে মায়ের মূর্তির সামনে উদাত্ত কণ্ঠে—

'আস্তিকস্য মুনের মাত জগৎ আনন্দকারিনী।
এহ্যেহি মনসাদেবী নাগমাতা নমোহস্তুতে।।'

এষ সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি 'ওঁ শ্রীমনসা দেবৈ নমঃ' মন্ত্রে অঞ্জলি দিয়ে থাকেন। আমরা দেখেছি আজ থেকে দশ-বিশ বছর আগেও গ্রামবাংলার নারীকে বিকাল বেলা মন্দিরে বসে মনসা বন্দনা গাইতে সমবেত হতেন। এ যেন নারীদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার মূল সোপান। সিস্টার নিবেদিতা ও আনন্দ কুমারস্বামী যৌথভাবে লেখা [Myths of the Hindus and Buddhists (1913)] গ্রন্থে দেবী মনসার কাহিনি ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। সেখানে তারা লিখেছেন যে সর্পদেবী মনসার উপাখ্যানটি মূলত বাংলার লোকায়ত দেবী ও পৌরাণিক শিবধর্মের মধ্যেকার সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলে।

**মনসা দেবী সম্পর্কে মূল বক্তব্য :**

- **ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক শেকড় :** তারা উল্লেখ করেছেন যে সর্পদেবী মনসার এই কিংবদন্তিটি এশিয়ান সংস্কৃতির প্রাচীন মাইকিনিয়ান যুগের সমসাময়িক বা ততোধিক প্রাচীন।
- **শৈবধর্ম বনাম লৌকিক শক্তি :** এই উপাখ্যানের মাধ্যমে বাংলার সমাজে প্রচলিত নারী লৌকিক শক্তির আরাধনা এবং প্রধান পুরুষ দেবতা শিবের উপাসনার মধ্যেকার পুরনো দ্বন্দ্ব ও তার পরে মিলনের রূপটি প্রকাশ পায়।
- **মাতৃকাশক্তির রূপ :** মনসা বা পদ্মাকে শেষ পর্যন্ত 'শক্তি' বা দেবী উমার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের কাছে দূরবর্তী ও নির্গুণ শিবের চেয়ে এই মাতৃকা রূপটি অনেক বেশি নিকটবর্তী ও প্রিয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

যত দূর পড়েছি আদ্যা শক্তি স্বরূপা মা সারদাকে একদিন এক ভক্ত মহিলা বলেন যে এমা এর পরে (মানে সারদা লীলায় যে অলৌকিক ও যুগ উপযোগী প্রকাশ হল তার পরে) আর কেউ মনসা শীতলা মানবে না। সারদা মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন 'তা কেন, তাঁরা তো আমারই অংশ'। অর্থ হল মা মনসাও সেই দেবী চন্ডী বা উমার অংশ বা কন্যা।

আজকের বৈজ্ঞানিক যুগেও মনসা পূজার গুরুত্ব কমে যায়নি। এটি আমাদের শেখায় মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান, জীববৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সমাজে সম্প্রীতির মূল্য।

অতএব, পদ্মা কাহিনি কেবল একটি দেবীর উপাখ্যান নয়; এটি বাংলার ইতিহাস, সাহিত্য, মাতৃত্ব, নারীশক্তি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং প্রকৃতিনির্ভর জীবনদর্শনের এক অমূল্য সাংস্কৃতিক দলিল। প্রার্থনা করি আমাদের সকলের ওপরে মায়ের কৃপা বর্ষিত হোক। 'জয় মা পদ্মা, জয় বিষহরী মাতা, জয় শঙ্কর দুহিতা মা মনসা।' জয় মা। ■

দুর্গা বাহিনীর পরিচিতি বর্গ, সুন্দরবন জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

# লৌকিক দেবী মা মনসা

## সুপ্রিয় ঘোষ

হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর কথা বললেই যে নামটি সর্বাগ্রে উঠে আসে, তা হল দেবী মনসার নাম। মূলত আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের পঞ্চমী তিথিতে মা মনসার পুজো করা হয়। এছাড়াও গঙ্গা পূজার দিন এবং শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বিশেষভাবে দেবী মনসা ও অষ্টনাগের পুজো করা হয়।

মঙ্গলকাব্য অনুযায়ী মা মনসা ভগবান শিবের ঔরসজাত কন্যা এবং তার মাতা দেবী চন্ডী। মঙ্গলকাব্য অনুসারে ভগবান শিব মর্ত্যে ভ্রমণরত অবস্থায় সাময়িক বিশ্রাম নিলে, তাঁর মনে বারবার দেবী চণ্ডীর কথা মনে পড়ে। তখন ভগবান শিবের দেহ থেকে দেবরশ্মি নিক্ষিপ্ত হলে তা পদ্ম পাতার মাধ্যমে পাতালে চলে যায় এবং সেখানেই দেবী মনসার জন্ম হয়। সেখানে নাগরাজ বাসুকি দেবী মনসাকে ভগিনী রূপে লালন পালন করেন। প্রথমে দেবী চণ্ডী তাঁকে কন্যা রূপে স্বীকৃতি না দিলেও পরবর্তীকালে দেবী চণ্ডী তাঁকে মেনে নেন।

আবার পুরাণ মতে মনসার পিতা হলেন ঋষি কশ্যপ। পিতামহ ব্রহ্মার আদেশের ঋষি কশ্যপের মন থেকে এক নারীর সৃষ্টি হয়। তাই তার নাম হয় মনসা।

যাইহোক ঋষি জরৎকারুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, কিন্তু জরৎকারু মুনি বিবাহের পূর্বে একটি শর্ত দিয়েছিলেন যে, মনসা তাঁর কথার অবাধ্য হলে, তিনি তাকে পরিত্যাগ করবেন। এরপর যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হল। কিন্তু বাসর ঘরে, বিবাহের দিন ভোররাতে মনসাকে ঋষি কুশ আনতে বললে, শিব কন্যা মনসা তা আনতে অস্বীকার করেন। তখন তাঁদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনসা নিজের স্বামীকে দংশন করে। ঋষি দেহ ত্যাগ করেন। মাতা চণ্ডী তা জানতে পারেন। তখন মাতা চণ্ডীর নির্দেশে মনসা সেই বিষ ফিরিয়ে নিলে, ঋষি পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠেন। এরপর পূর্ব শর্ত অনুযায়ী জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করে এক পুত্র অস্বিককে সঙ্গে নিয়ে বনবাসে চলে যান। পদ্মপুরাণ অনুসারে দেবীর আরো আট সন্তান আছে, যারা অষ্টনাগ নামে পরিচিত। তারা হলেন—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলিকা, কর্কট ও শঙ্খ।

মা মনসা ভগবান শিবের কন্যা হলেও জন্ম সংক্রান্ত বিতর্কের জন্য তাকে মর্ত্যলোকে দেবী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। পরম শিব ভক্ত চাঁদ সওদাগরের মাধ্যমে তিনি নিজেকে দেবী হিসেবে মর্ত্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং একনিষ্ঠ মানব ভক্তমণ্ডলী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরম শিব ভক্ত যে হাত দিয়ে মহাদেবের পূজা করেন, সে হাত দিয়ে অন্য কোন দেবতার পুজো করতে অস্বীকার করেন। তারপর মনসা চাঁদ সওদাগরকে ভয় দেখিয়ে নানা ভাবে তাঁর ক্ষতি করে পূজা নিতে চান। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী অধ্যায়।

সেই সময় ব্যবসা হতো মূলত জলপথে। দেবী তখন চাঁদ সদাগরের সমস্ত বাজরাগুলো একে একে জলে ডুবিয়ে ফেলতে শুরু করেন। বিপুল অর্থ হানি শুরু হয়, এতেও চাঁদ সওদাগরকে দমানো গেল না। একে একে তাঁর ছয় পুত্রকে সর্প দংশন করে মেরে ফেলেন। আর্থিক, পারিবারিক ক্ষতিতে জর্জরিত চাঁদ সওদাগর ব্যবসা করার সমস্ত উদ্যম হারিয়ে ফেলেন। এভাবে কিছু বছর সব স্থিত থাকার পর আবার চাঁদ সদাগর তাঁর ব্যবসা শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে উদ্যম পেতে শুরু করেন। এমন একদিন চাঁদ সদাগর সমুদ্র থেকে ফেরার পথে হঠাৎ ঝড় উঠল, বলা ভালো মা মনসাই এই ঝড়টা শুরু করেন। এই ঝড়েই চাঁদ সওদাগরের জাহাজ ডুবে যায়, তাঁর সমস্ত সঙ্গী সাথী মারা যায়, চাঁদ কোনরকমে প্রাণী বেঁচে যান। এতকিছুর পরেও তিনি মা মনসার পুজো করলেন না।

এমতবস্থায় মনসা তাঁর দুই সখীর সাহায্য নেন। তাঁদের মধ্যে একজন চাঁদের পুত্র লক্ষিন্দর হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেন, আরেকজন চাঁদের বন্ধু সোয়া বেনের পুত্রী বেহুলা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। দুজনে ক্রমশ বড় হলে, তাদের মধ্যে বিবাহ ঠিক হয়। কিন্তু কুষ্টি মিলিয়ে দেখা গেল, বিবাহের রাতেই লক্ষিন্দরের সাপের কামড়ের যোগ রয়েছে। চাঁদ সওদাগর তখন বিশ্বকর্মাদেবকে দিয়ে তাঁর পুত্রের বাসর ঘরের জন্য একটি লৌহ প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যাতে সাপ কেন, একটি মাছিও যাতে এখানে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু বিশ্বকর্মা মা মনসার অনুরোধে বাসর ঘরে খুব ছোট্ট

একটি ছিদ্র রাখলেন। দেবী মনসা সাপ পাঠিয়ে লক্ষিন্দরের প্রাণ হরণ করলেন, এর পরের কথা সবার জানা। কিভাবে আবার বেহুলা কলার ভেলা ভাসিয়ে মা মনসার কৃপায় লক্ষিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। তখন শেষ পর্যন্ত চাঁদ সওদাগর মা মনসার পুজো করতে সম্মত হন। কিন্তু তিনি যে ডান হাত দিয়ে মহাদেবের পুজো করেন, সেই ডান হাত দিয়ে মা মনসার পুজো করতে অস্বীকার করেন। তাই চাঁদ, মা মনসার দিকে পিছন ফিরে বসে বাম হাত দিয়ে মা মনসার পূজা করেন। আর মা মনসা তাতেই খুশি হয়ে চাঁদ সওদাগরের সমস্ত পুত্র, ধন, মান, সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। এরপর থেকেই মর্ত্যে মা মনসার পূজার প্রচলন হয় এবং তিনি দেবী রূপে স্বীকৃতি পান।

আপাতদৃষ্টিতে সর্পদেবীকে ভয়ঙ্করী বলে মনে হলেও তিনি সর্ব কল্যাণকারী শিবকন্যা মনসা রূপে পরিচিত। তাই তাঁর পুষ্পাঞ্জলি মঞ্চে আমরা বলে থাকি—

আগচ্ছে বরদে দেবী সর্ব কল্যাণকারিণী।
সর্পভয় বিনাশিনী মনসা দেবীর নমস্ততে।।

কিংবদন্তি অনুসারে দেবী মনসার মাতা, দেবী চণ্ডীর দ্বারা মনসার একটি চোখ বিনষ্ট হয়েছিল। প্রথমদিকে দেবী চণ্ডী তাঁকে কন্যা রূপে স্বীকৃতি না দিলেও, পরবর্তীকালে নিজের কন্যা রূপে মেনে নেন।

দেবী মনসার পূজা কেউ চিত্রপটে করেন, কেউ বা স্নুহী বৃক্ষে করেন, যা ফণী মনসা বা সিউর বা সিহুন্ত গাছ নামেও পরিচিত। তবে কোথাও কোথাও আবার পঞ্চসর্প ফণা যুক্ত প্রতিমাতেও মনসা পূজা করা হয়ে থাকে। কোথাও আবার ঘট পূজার প্রচলন আছ। প্রধানত নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকার বাংলা, বিহার উড়িষ্যা, আসামে এই দেবীর পূজা করা হয়। এর সঙ্গে অষ্ট নাগের পূজা করা হয়। মনসা পূজার প্রধান নৈবেদ্য দুধ ও কলা। পদ্মপাতায় তাঁর জন্ম, তাই তার আরেক নাম পদ্মাবতী। দেবী বিষহরণ করেন বলে তিনি বিষহরি নামেও পরিচিত। পুরাণ অনুসারে, সমুদ্র মন্থনে ভোলানাথ যে বিষ পান করেছিলেন, তা মনসার মধ্যে সঞ্চার হয়। অর্থাৎ কন্যা মনসা তা গ্রহণ করেন, তাই মা মনসার আর এক নাম বিষহরি।

মা মনসা কোথাও বাহন রাজহংসের উপর, কোথাও বা পদ্মের উপর উপবিষ্ট থাকেন। তার ডান দিকে থাকে সুগন্ধা, বাম দিকে থাকে নিতাদেবী। দেবীর চার হাতে রয়েছে—পদ্ম, শঙ্খ, সর্প ও অভয় মুদ্রা। মাথার উপরে রয়েছে পঞ্চসর্পের ছত্র। মা মনসা মূলত লৌকিক দেবী, তাই স্থানভেদে, বংশ ভেদে এই দেবীর পূজার রীতি-নীতির অনেক পার্থক্য দেখা যায়। সবশেষে দেবীকে প্রণাম করে বলা যায়—

অস্থিকস্য মুনের মাতা চ ভগিনী বাসুকি স্তথা।
জরৎকারু মুনি পত্নী মনসা দেবী নমস্ততে।। ■

বিশ্ব হিন্দু বার্তার পক্ষ থেকে রথযাত্রায় জলছত্র, দাঁতন, দক্ষিণবঙ্গ

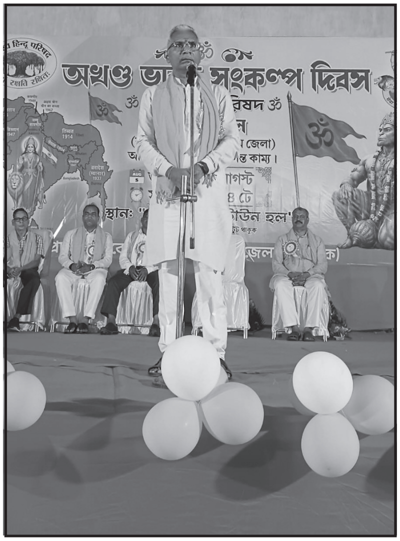


অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস পালন
ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণবঙ্গ

# ঐতিহ্য ও পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে সনাতন রথযাত্রা প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত

বিপ্লব চক্রবর্তী

আষাঢ় মাসে যখন প্রথম বর্ষার বাতাস উত্তর-পূর্বের পাহাড়ে এসে লাগে তখন আকাশ বাতাস ভরে ওঠে শঙ্খধ্বনি, ঢাকের বোল আর ভক্তিগীতে। ত্রিপুরায় আগরতলার রাজপথে প্রভু জগন্নাথের বিশাল কাষ্ঠময় রথ চলতে শুরু করে সহস্র ভক্তের বাহুবলে। অসমে বরপেটার সত্রে এবং গুয়াহাটির প্রাচীন মন্দিরের গলিতে আরেকটি রথ অগ্রসর হয় কীর্তন ও খোলের তালে তালে। রাজ্য ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, তবু দুই রথের নিচে যে চাকাটি ঘুরছে তা এক। তাহাই 'সনাতন কালচক্র'।

'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎপ্রবৃদ্ধো'

'আমিই কাল, লোকসংহারকারী মহাকাল।'

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১.৩২)

এই কালচক্র অনাদি অনন্ত। সনাতন ধর্ম বলে সময় সরলরেখা নয়, তাহা আবর্তনশীল। যাহা যায় তাহা আবার ফিরিয়া আসে, যাহা ভাঙে তাহা আবার গড়ে।

ত্রিপুরায় এই চাকার কথা শুধু পাথরে ও আচারে লেখা নাই, লিপিবদ্ধ আছে রাজমালায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহারাজা ধর্ম মানিক্যের সময়ে রচিত রাজমালা ভারতের প্রাচীনতম রাজবংশের ইতিহাসগুলির অন্যতম। রাজমালা মানিক্য রাজাদের কেবল বিজেতা রূপে দেখায় নাই, দেখাইয়াছে ধর্মের রক্ষক রূপে। তাঁহারা নিজেদের উৎপত্তি চন্দ্রবংশের দ্রুহ্য হইতে মানিতেন। পাঁচ শতাধিক বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল সিংহাসনের রাজা বড় নন, মন্দিরের প্রভুই প্রকৃত রাজা। এই বিশ্বাসের পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছিল জগন্নাথের আরাধনায়।

এক সহস্র বৎসরের অধিক কাল ত্রিপুরার রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ছিল উদয়পুর, পূর্বনাম রঙ্গামাটি। ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে রাজা জুজারুফা আরাকান জয় করিয়া ইহাকে রাজধানী করেন। এই হ্রদ ও মন্দিরের নগরী হইতে উনষাট জন রাজা রাজ্য শাসন করিয়াছেন। এখানেই ত্রিপুরায় জগন্নাথ ভক্তি দৃঢ়মূল হইয়াছিল। উদয়পুরের মধ্যস্থলে যে বিশাল জলাশয় তাহার নাম জগন্নাথ দিঘি। ১৯০১ সালে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য দিঘির উত্তর তীরে বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করিলেও দিঘিটি তাহার বহু পূর্বের। লোকশ্রুতি আছে প্রাচীনকালে এখানে নীলমাধবের পূজা হইত, সেই নীলমাধবই পরে পুরীধামে প্রকাশিত হন। এইভাবে ত্রিপুরার পাহাড় ওড়িশার সমুদ্রতীরের মধ্যে এক অদৃশ্য আধ্যাত্মিক সেতু রচিত হইয়াছিল।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণ মানিক্য রাজধানী আগরতলায় আনিলে এই ভক্তিও সঙ্গে আসিল। ১৮৯৯ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের প্রাঙ্গণে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করিলেন। পুরী হইতে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার বিগ্রহ আনিয়া রাজকীয় মর্যাদায় রথযাত্রার প্রচলন হইল। আজ এক শত দশ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া প্রতি আষাঢ়ে প্রভু গর্ভগৃহ ত্যাগ করিয়া জনতার পথে নামেন। তিনি ভক্তকে ডাকেন না, তিনি নিজেই ভক্তের দ্বারে উপস্থিত হন।

'রথস্থো বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

'রথের উপর বামনরূপী প্রভুকে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না।'

পুরাণে আছে জগন্নাথ কুরুক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে মাসির বাড়ি গিয়াছিলেন। রথযাত্রা সেই লীলারই স্মরণ। কিন্তু সনাতন দৃষ্টিতে ইহা কেবল পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা নয়। ইহা চিরন্তন সত্য যে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে অবতরণ করেন। রথের প্রকাণ্ড চাকাগুলিই কালচক্র। প্রভু সাত দিনের জন্য বাহিরে যান এবং পুনরায় মন্দিরে ফেরেন। মানুষের জীবনও তেমন বিরহ ও মিলন, কষ্ট ও কৃপার চক্রে ঘুরিতে থাকে।

ত্রিপুরার রথযাত্রার বিশেষত্ব হইল ইহার সর্বজনীনতা। মানিক্য রাজারা ছিলেন চতুর্দশ দেবতারও রক্ষক। বাঙালি, জমাতিয়া, দেববর্মা সকল সম্প্রদায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই ভূমিতে বাস করিয়াছে। রথের রশিতে সকলের হাত লাগে। দুর্গাপূজার পর ইহাই রাজ্যের বৃহত্তম সমাগম। ধর্ম ও জাতির ভেদ ভুলিয়া মানুষ একসঙ্গে রশি টানে। ইহাই সনাতনের অর্থ—যাহা সকলকে ধারণ করে বলিয়াই চিরন্তন।

অসমেও একই চাকা ঘোরে, ভিন্ন সুরে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সমগ্র অসমে একশরণ ধর্ম প্রচার করিলেন। তিনি কৃষ্ণভক্তির পথ দেখাইলেন। যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে জগন্নাথ পূজা প্রতিষ্ঠা করেন নাই,

তথাপি তাঁহার আন্দোলন সেই ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল। শিষ্য মাধবদেবের বরপেটা সত্রে রথযাত্রা আজ অন্যতম প্রধান উৎসব। বরগীত ও নামের ধ্বনিতে রথ অগ্রসর হয়। গুয়াহাটির বেলতলার চার শত বৎসরের পুরাতন জগন্নাথ মন্দির সাক্ষ্য দেয় যে আহোম রাজারাও এই ধার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মানিক্যদের ন্যায় আহোমরাও রাজাকে ধর্মের রক্ষক মানিতেন।

পৌরাণিক দিক হইতে দেখিলে ত্রিপুরা ও অসম একই বার্তায় মিলিত হয়। পুরীতে প্রভু যান গুণ্ডিচা মন্দিরে, মাসির গৃহে। উত্তর-পূর্বে ইহা ব্যাখ্যাত হয় প্রান্তবাসীর প্রতি প্রভুর করুণা রূপে। মহাভারতে কৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের সারথি। রথযাত্রায় সেই সম্পর্ক বিপরীত হইয়া যায়। জগন্নাথ রূপে কৃষ্ণ নিজে রথারূঢ় হন, আর জনগণ হয় তাঁহার সারথি।

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।'

'হে ভারত, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি।'

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪.৭)

ধর্মকে অগ্রসর করিতে হইলে কেবল রাজা বা পুরোহিত নহে, কৃষক, শিক্ষক, যুবক, বৃদ্ধ সকলকে রশি ধরিতে হইবে। নতুবা চাকা নড়িবে না।

উদয়পুরের জগন্নাথ দিঘি হইতে আগরতলার রাজমন্দির, বরপেটার সত্র হইতে বেলতলার মন্দির—সর্বত্র একই কথা ধ্বনিত হয়। ঈশ্বর আবদ্ধ থাকেন না, তিনি যাত্রা করেন। আর যাত্রা করিয়াই তিনি কালকে নবীন করেন। ঋষিরা ইহাকেই কালচক্র বলিয়াছেন। যে চাকায় মরিচা ধরে না, কারণ প্রতি বৎসর তাহা বৃষ্টিতে ও ভক্তির অশ্রুতে ধৌত হয়।

অতএব ত্রিপুরা ও অসমের রথযাত্রা কেবল উৎসব নহে। ইহা ইতিহাসের আত্মস্মরণ। রাজমালা লিখিয়া রাখিয়াছে কাহারা ইহাকে পালন করিয়াছেন। উদয়পুর রাখিয়াছে নামের দিঘি। আগরতলা রাখিয়াছে প্রদর্শনের রথ। অসম রাখিয়াছে বহন করিবার গান। একত্রে তাহারা বলে উত্তর-পূর্বে ধর্ম সর্বদা চলমান। তাহা পাথর হইতে বাহির হয়, কাঠের উপর আরোহণ করে, আর আমাদিগকে আহ্বান জানায়—এসো, রশি ধরো।

আর প্রতি বৎসর যখন চাকাটি গুরুগম্ভীর শব্দে ঘুরিতে থাকে তখন বুঝিতে হয় ইহা কেবল কাঠের গতি নহে। ইহা কালের গতি। ইহা আমাদের মাঝে ধর্মের পদচারণা। ইহা সনাতনের চিরন্তন চাকা, যাহা ত্রিপুরা ও অসমের বুক দিয়া চলিতে চলিতে আমাদিগকে আবার ডাকে—এসো, ইহাকে সম্মুখে লইয়া চলো। ■

পরিষদ বার্তা

## দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বৈঠক

গত ২৫ ও ২৬শে জুলাই, শনিবার ও রবিবার তাঁতিবেড়িয়ার সরস্বতী শিশু মন্দিরে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ সংগঠন মহামন্ত্রী শ্রীবিনায়ক রাও দেশপাণ্ডে, ক্ষেত্র সম্পাদক শ্রীঅমিয় সরকার, ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী শ্রীসোহান সিং সোলাঙ্কি, প্রান্তের কার্যকরী সভাপতি শ্রীঅজয় গোয়েল, নব নিযুক্ত প্রান্ত সম্পাদক জয়দেব সাহা, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক শ্রীমানিক চন্দ্র পাল, ক্ষেত্র সেবা প্রমুখ শ্রীসুধাংশুকুমার পাত্র এবং প্রান্তের বিভিন্ন কার্যকর্তারা ও জেলার কার্যকর্তারা। এই বৈঠকে দুইদিন ব্যাপী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, পূর্বের প্রান্ত সম্পাদক শ্রীচন্দ্রনাথ মহাশয়কে ক্ষেত্রীয় নৈতিক শিক্ষা প্রমুখের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বৈঠক প্রান্তের বিভিন্ন আয়ামের জন্য নতুন দায়িত্ব ঘোষণা করা হয়। শ্রীসুনীল করণকে প্রান্তসেবা প্রমুখ, শ্রীঅরূপ সিংহকে প্রান্তের সহ গোরক্ষা প্রমুখ, শ্রীমতি বর্ণালী মণ্ডলকে প্রান্ত সহ সৎসঙ্গ প্রমুখ, শ্রীরক্তিম দাসকে প্রান্ত প্রচার-প্রসার প্রমুখ, ডঃ পূর্ণচন্দ্র মাইতিকে প্রান্ত নৈতিক শিক্ষা প্রমুখ, আইনবিদ শ্রীতরুণ দাসকে প্রান্তের বিধি প্রকোষ্ঠ প্রমুখ এবং আইনবিদ শ্রীঅনির্বাণ মিত্রকে সহ বিধি প্রকোষ্ঠ প্রমুখ, শ্রীমতি পারমিতা গুছাইতকে মাতৃশক্তির সৎসঙ্গ প্রমুখ, শ্রীরাজ চট্টোরাজকে কলকাতা পূর্ব বিভাগের সংগঠন সম্পাদকের, শ্রীঅশোক বাউরীকে গোপালী আশ্রম, শ্রীহরিদাস গায়েনকে ঝাড়গ্রাম আশ্রমের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শ্রীঅলক সুর মহাশয় এবং শ্রীসুশীল সিংহমকে দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হয়। অন্যান্য দায়িত্ব পূর্ব অনুযায়ী থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়। এই বৈঠকে ১৫০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে দুর্গাবাহিনী এবং মাতৃশক্তির সদস্যরাও ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু বার্তার পক্ষ থেকে এই নতুন প্রান্ত সমিতির সকল সদস্যদের অভিনন্দন জানাই। আশা করা হচ্ছে, এই সমিতি প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংগঠনকে নতুন গতিপথ প্রদান করবে।

# ১৪ই আগস্ট : বিভাজনের বেদনা ও 'অখণ্ড ভারত' দিবসের তাৎপর্য

পল্লব দে

১৪ই আগস্ট কেবল একটি তারিখ নয়; এটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গভীর শোক ও বিভাজনের দিন। ১৯৪৭ সালের এই দিনে ধর্মের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র তৈরি করা হয়েছিল।

**বিভাজনের পটভূমি ও ঐতিহাসিক ভুলসমূহ**

- **দ্বিজাতি তত্ত্ব ও মুসলিম লীগের আন্দোলন :** তৎকালীন মুসলিম লীগ দাবি করে যে হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতি এবং তারা একসঙ্গে বসবাস করতে পারবে না। তারা যুক্তি দেয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত নয়। এর ফলে পৃথক রাষ্ট্রের আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়।
- **মহাত্মা গান্ধীর অবস্থান ও ব্যর্থতা :** মহাত্মা গান্ধী বিভাজনের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে দেশভাগ হলে তা হবে তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে। কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও সহিংসতা দমনে অকার্যকর ব্যবস্থার কারণে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।
- **১৯৪৬-এর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (Direct Action Day) :** ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ সালে জিন্নার আহ্বানে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালিত হয়। কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা সৃষ্টি হয়, যেখানে হাজার হাজার নিরীহ হিন্দু প্রাণ হারান এবং বিপুল সম্পত্তি লুণ্ঠন হয়।
- **যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সিদ্ধান্ত ও পরবর্তী পরিণতি :** দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মনে করেছিলেন যে, বর্ণহিন্দুদের চেয়ে মুসলিম লীগ তাদের বেশি অধিকার দেবে। তিনি জিন্নার সাথে হাত মেলান এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রথম আইন ও শ্রমমন্ত্রী হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে পাকিস্তানে অমুসলিমদের কোন নিরাপত্তা নেই। নিদারুণ হিন্দু নির্যাতন ও অত্যাচার দেখে অবশেষে ১৯৫০ সালে তিনি পদত্যাগ করে ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হন।
- **নোয়াখালি দাঙ্গা ও ধারাবাহিক সহিংসতা :** ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে লক্ষ্মীপূজার দিনে নোয়াখালিতে শুরু হয় মারাত্মক এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। হিন্দু জনগণের ওপর নেমে আসে নারকীয় হত্যালীলা। লুণ্ঠন, জোরপূর্বক ধর্মান্তর এবং হিন্দু নারীদের ওপর নির্মম অত্যাচারের ঘটনা ঘটে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অসংগঠিত সাধারণ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে দিশেহারা করে তোলে।

**জনমিতির পরিবর্তন (Demographic Shift)**

দেশভাগের সময় ও বর্তমানের পরিসংখ্যান লক্ষ করলে জনমিতির এক বিশাল পরিবর্তন চোখে পড়ে :

| অঞ্চল | ১৯৪৭ সালে অমুসলিম/ মুসলিম অনুপাত | বর্তমান অনুপাত (আনুমানিক) |
|---|---|---|
| পাকিস্তান (অমুসলিম/ হিন্দু) | প্রায় ২২%-২৩% | বর্তমানে ৩%-এরও কম |
| ভারত (মুসলিম জনসংখ্যা) | প্রায় ৯.৮%-১২% | বর্তমানে প্রায় ১৪%-১৫% (কোন কোন অঞ্চলে আরও বেশি) |

পাকিস্তানের মতো দেশে সংখ্যালঘুরা বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠী ধারাবাহিক অত্যাচার, ধর্মান্তর ও নিরাপত্তার অভাবে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে, যা ইতিহাসের একটি কঠিন সত্য।

**বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ ও জাগরণের প্রয়োজনীয়তা**

ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে। বর্তমানেও বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায় ধর্মীয় শোভাযাত্রায় আক্রমণ, মন্দিরে ভাঙচুর এবং হিন্দু সমাজের

মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজন। যখন সমাজ অসংগঠিত থাকে, তখন তাদের অধিকার ও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। অসংগঠিত হিন্দুরা আগামী দিনে অস্তিত্ব সংকটের কবলে পড়বে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে হিন্দু জাতি।

**জুয়িশ (ইহুদি) জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা**

ইহুদি জাতি শত শত বছর ধরে নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু তারা তাদের মূল চেতনা এবং জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা হারায়নি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই সংকল্প টিকিয়ে রাখার ফলেই তারা অবশেষে নিজেদের ঐতিহাসিক মাতৃভূমি ইসরায়েল পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

**১৪ই আগস্টের শপথ :** কেন পালিত হয় অখণ্ড ভারত দিবস?

**১৪ই আগস্টের এই দিনে গেরুয়া পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য তিনটি :**

**১. স্মরণ ও শ্রদ্ধা :** বিভাজনের সময় যে কোটি কোটি হিন্দু প্রাণ হারিয়েছেন, বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং নিজেদের মাতৃভূমি হারিয়েছেন, তাঁদের বলিদানকে স্মরণ করা।

**২. সচেতনতা ও প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা :** আগামীর প্রজন্মকে ইতিহাসের সত্য জানানো, যাতে তারা অসংগঠিত না থেকে একটি সচেতন, ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী সমাজ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

**৩. অখণ্ডতার সংকল্প :** ভারতকে আর নতুন করে খণ্ডিত হতে না দেওয়া এবং হারিয়ে যাওয়া ভারতের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার সংকল্প নেওয়া।

**উপসংহার :** ১৪ই আগস্ট কেবল বিভাজনের ট্র্যাজেডিকে মনে করার দিন নয়, এটি নিজেদের ভুল সংশোধন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করার এবং একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার শপথ নেওয়ার দিন। ■

পরিষদ বার্তা

## উত্তর বীরভূম জেলার খড়মাডাঙ্গাতে মধ্যবঙ্গ প্রান্তের পরিষদ শিক্ষা বর্গ

গত ১৭ই মে ২০২৬ থেকে ২৭শে মে ২০২৬ মধ্যবঙ্গ প্রান্তের পরিষদ শিক্ষা বর্গ উত্তর বীরভূম জেলার খড়মাডাঙ্গাতে অনুষ্ঠিত হয়। বর্গে ৫৯ স্থান থেকে ১০ জন মাতৃ দূর্গা এবং ৮২ জন পুরুষ কার্যকর্তা উপস্থিত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কেন্দ্র থেকে সহ সংগঠন মহামন্ত্রী মাননীয় বিনায়ক রাওজী, কেন্দ্রীয় গোরক্ষা প্রমুখ মাননীয় দীনেশ উপাধ্যায়জী, ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক মাননীয় সোহন সিং সোলাঙ্কি, পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক মাননীয় রমাপদ পাল, ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ মাননীয় গৌতম সরকার, তিন প্রান্তের সেবা প্রমুখ তথা বর্গপালক মাননীয় কুশল কুণ্ডু, বর্গ প্রমুখ হিসাবে প্রান্ত সহ সভাপতি মাননীয়া সুনন্দা ঠাকুর মহাশয়া ছাড়াও প্রান্তের অন্য অধিকারীগণ কার্যকারী সভাপতি মাননীয় অরিন কুমার মণ্ডল, প্রান্ত সম্পাদক মাননীয় তরুণ কুমার লায়েক, সহ সম্পাদক মাননীয় অসীম কুমার সিংহ রায়, সংগঠন সম্পাদক মাননীয় বিজয় পাতর, বৌদ্ধক, বৈঠক, চর্চার মাধ্যমে বর্গের মান উন্নত করেন। সকলে আগ্রহের সঙ্গে বর্গের সকল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

## বাঁকুড়া জেলার বদড়া সরস্বতী শিশু মন্দিরে প্রান্ত শৌর্য প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ৩১ মে ২০২৬ থেকে ৬ই জুন ২০২৬ পর্যন্ত মধ্যবঙ্গ প্রান্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল প্রান্ত শৌর্য প্রশিক্ষণ বর্গ বাঁকুড়া জেলার বদড়া সরস্বতী শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রান্তের সমস্ত জেলার ৫৪ স্থান থেকে মোট ১৫৭ জন শিক্ষার্থী বর্গে অংশগ্রহণ করেন। ২৪ জন শিক্ষক দণ্ডযুদ্ধ, নিযুদ্ধ, যষ্ঠী, সমতা, যোগাসন, ব্যায়াম যোগের শিক্ষা দেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রমুখ তথা পূর্ব রাষ্ট্রীয় বজরঙ্গ দল সংযোজক মাননীয় মনোজ বার্মাজী, ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক সোহন সিং সোলাঙ্কি, ক্ষেত্র গোরক্ষা প্রমুখ মাননীয় অমল চক্রবর্তী, ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ মাননীয় গৌতম সরকার, তিন প্রান্ত সেবা প্রমুখ মাননীয় কুশল কুণ্ডু, প্রান্ত সম্পাদক মাননীয় তরুণকুমার লায়েক, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক মাননীয় বিজয় পাতর, প্রান্ত মন্দির অর্চক পুরোহিত প্রমুখ মাননীয় রণধীর মুখার্জি, প্রান্ত বজরঙ্গ দল সংযোজক মাননীয় বাপ্পা দাস প্রমুখ বৌদ্ধিক এবং বৈঠকের মাধ্যমে বর্গকে সুপরিচালনা করেন। সোমারোপ কার্যক্রমে প্রায় পাঁচ শতাধিক দর্শকের সামনে শিক্ষার্থীরা তাদের শারীরিক প্রদর্শন করেন।

# ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

## দিলীপ কুমার ঝাঁওর

**দ্বি**জাতি তত্ত্বের উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করা হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এবং স্বাধীনতা প্রদান করে ইংরেজ সরকার। মানুষ ভাবল এখন সব সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু নেহরুজির কংগ্রেস একটা বিষফোঁড়া রেখে দেয় ঐচ্ছিক ভাবে দেশ পরিবর্তন করার। ফলে মুসলমানদের একাংশ ভারতেই থেকে গেল এবং সুবিধা ভোগ করে ক্রমশ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়। অথচ এই নেহরুজিকে মুসলিম লীগ বারংবার হিন্দুদের সমর্থক সরকার চালাচ্ছে বলে উত্যক্ত করতে লাগল। নেহরুজি তখন মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করাতে চাইলেন যে তাদের ধারণা ভুল, বাস্তবে কংগ্রেস পার্টিই মুসলিম হিতৈষী দল। যদিও এর আগে নেহরুজিই সবাইকে বলতেন গান্ধীজির খিলাফত আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের কট্টরতাবাদ বেড়েছে। মুসলিম তোষণ করার জন্য নেহরু একের পর এক তাদের সুবিধা ও ফলদায়ক স্কিম চালু করে। এছাড়া নেহরুর ভুল নীতির কারণে মার্কসবাদ ভারতে প্রভাব বিস্তার শুরু করে একই সময়ে।

গান্ধীজির হত্যার মিথ্যা অভিযোগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আর.এস.এস) উপর প্রতিবন্ধকতা লাগিয়ে দেয় নেহরু সরকার। অনেক বিচার বিশ্লেষণ করার পর সংঘের সমর্থনে কথা বলার জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন নির্মাণ করা হয়, যার নাম রাখা হয় ভারতীয় জনসংঘ। এই জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি নেহরু দ্বারা কাশ্মীরের জন্য ৩৭০ ধারা চালু করার বিরোধিতা করে শ্রীনগরে পৌঁছে কারাবরণ করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে কারাগারে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু হল। কিন্তু তখনকার প্রশাসন ওঁনার আকস্মিক মৃত্যুর কোনরকম তদন্ত করল না। শ্যামাপ্রসাদজির মৃত্যুর রহস্য আজও প্রকাশিত হয়নি। ওঁনার মৃত্যুর ফলে সবে জন্ম নেওয়া জনসংঘ এক ঝটকা পেল। কিন্তু দিশাহীন জনসংঘকে নেতৃত্ব দেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, বলরাজ মোধক, অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রমুখ নেতা।

ঠিক সেই সময় খ্রিস্টানরা চার্চ, বিদ্যালয়, ঋণ দেওয়ার সংস্থা ইত্যাদির আড়ালে ব্যাপক ধর্মান্তকরণের কাজ শুরু হয়। এই অভিযোগ ওঠার পর মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার প্রাক্তন বিচারপতি বি.এস.নিয়োগীর নেতৃত্বে একটি আয়োগ গঠন করে। এই আয়োগ মিশনারীদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করে বলেন যে, ধর্মান্তরণ একটি জাগতিক ষড়যন্ত্র এবং অবিলম্বে এর উপর রাশ টানা দরকার। তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে মধ্যপ্রদেশ সরকার ধর্মান্তরণ বিরোধী আইন চালু করে প্রদেশে।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইন্টারন্যাশনাল ইউরিসটিক কংগ্রেস সম্মেলনে অংশ নিতে মুম্বাই আসেন পোপ পৌল (6th pope) এবং বলেন, 'ভারতবর্ষের প্রত্যেক শহরে মিশনারিরা অন্তত ১০৮ জন হিন্দুদের ধর্ম পরিবর্তন করাক, কারণ ১০৮ নম্বরটি হিন্দুদের একটি পবিত্র সংখ্যা।' এর প্রতি উত্তরে চিন্ময় মিশনের স্বামী চিন্ময়ানন্দ সরস্বতী বলেন, 'যদি পোপ ১০৮টি হিন্দু ধর্মান্তর করাবে, তাহলে আমি ১০০৮ জন খ্রিস্টানকে হিন্দুতে ধর্মান্তরিত করাবো'। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অনেক আগে থেকেই ভাবছিল যে এই কাজে সঙ্ঘের কিছু করা দরকার। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীমাধব সদাশিব রাও গোলওয়ালকারজি এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা সংঘ প্রচারক দাদা সাহেব আপটে চিন্তা করলেন যে হিন্দুদের সংগঠিত করার জন্য একটি সংস্থা বানানো দরকার। সেই মতো ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ২৯শে আগস্ট কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে সব ধর্ম, পন্থ এবং সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তরা মুম্বাই শহরে সান্দপনী আশ্রমে একটি সংস্থা নির্মাণ করে আশীর্বাদ প্রদান করেন। যার নাম রাখা হয় 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'।

আর.এস.এস এই প্রথম ধর্মক্ষেত্র ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংগঠন নির্মাণ করার শপথ নেয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলাতে হিন্দু সম্মেলন করে, যার নাম দেওয়া হয় 'একাত্মতা পরিষদ'। সেখানে নির্ণয় করা হয়, ধর্মান্তরণ রোধ করতে হবে এবং গো-হত্যা বন্ধ করতে হবে। তাই তারা সাধু-সন্তদের নিয়ে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে গো-হত্যা বন্ধ করার জন্য সংসদ ভবন অভিযান করে। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সাধু-

সন্তদের উপর গুলি চালানোর আদেশ দেয়। ফলে অনেক সাধু-সন্তের মৃত্যু হয় রাজপথে।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরম গ্রামে ৩০০ পরিবারকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং গ্রামের নাম বদল করে রহমত নগর করে দেওয়া হয়। বাস্তবে মুসলমান সমাজ যখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তখনই জায়গার নাম বদল করে দেয়। যেমন—অনন্তনাগকে করা হল ইসলামাবাদ, সারদা পীঠকে করা হল দরগাহ-এ-শরীফ, শংকরাচার্যের মন্দিরকে তখ্ত-এ-সুলেমা, হরি পর্বতকে কোহ-এ-সুলেমান বানিয়ে দিয়েছে। এই কাজ দ্বারা সেই জায়গার মূল সংস্কৃতি এবং বিচারধারাকে সমূলে নষ্ট করতে চায় তারা। মীনাক্ষীপুরমের ঘটনাতে সংঘ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামনে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ দাঁড় করে দেয়। এই সময়কালে মাননীয় অশোক সিংহলজি দিল্লিতে ছিলেন। ওঁনাকে ১৯৮১-র নভেম্বর মাসে বিরাট হিন্দু সম্মেলনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাশ্মীরের রাজা শ্রীকরণ সিংহকে ওই সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি তাঁর ভাষণে সমগ্র হিন্দু সমাজকে অনুরোধ করেন যে, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার মনোভাব ত্যাগ করতে, কারণ এই পরম্পরা কখনোই হিন্দু ধর্মের অঙ্গ ছিল না, বাস্তবে এটি একটি ব্যবস্থা মাত্র ছিল। আমরা যখন পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছ-পালা সবকিছুর মধ্যে দেবতার বাস দেখি, তাহলে কেন মানুষের মধ্যে তা দেখি না? মঞ্চ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বুদ্ধানন্দ, স্বামী করপত্রীজি মহারাজ শ্রীকরণ সিংহজির বক্তব্যকে সমর্থন করেন। বোট ক্লাবের ওই সমাবেশে প্রায় ৬০টির বেশি ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বোট ক্লাবের বিরাট হিন্দু সম্মেলনে অনুভব করা হল যে হিন্দু সমাজ এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের সমাধান খুঁজতে চাইছে। সংঘ তখন মোরপন্থ পিঙলেজিকে একাত্মা যাত্রা সংগঠিত করার দায়িত্ব দেয়। পিঙলেজি এই কাজে অশোক সিংহলজিকে তাঁর সঙ্গী করে নেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে, সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে, বিভিন্ন বিভাগে ৯২টি যাত্রার আয়োজন করেন। যার মধ্যে ৮৯টি উপযাত্রা এবং ৩টি মূল যাত্রা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর থেকে গুজরাটের সোমনাথ পর্যন্ত, হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারী এবং কাঠমুন্ডু থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত যাত্রা করা হয়। এই যাত্রাগুলোর মাধ্যমে ৮০ হাজার কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করা হয় এবং ৩ লক্ষ গ্রামের মানুষের মধ্যে হিন্দুদের ধর্মান্তরণ এবং ইসলামীদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের বিষয় তুলে ধরা হয়। এই তিনটি প্রমুখ যাত্রার সমাপন মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে করে, মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এই যাত্রার ফলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নাম ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। যাত্রার প্রধান কান্ডারী অশোক সিংহলজি হিন্দু হৃদয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই একাত্মতা যাত্রার পরেই ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে রাম জানকী যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই যাত্রায় সাতটি পৃথক পৃথক রথে অযোধ্যার অর্থাৎ জেলে বন্দী শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিচ্ছবির মতন বড় বড় প্রতিমা নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রা মূলতঃ উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে পরিচালনা করা হয় হিন্দু একতাকে দৃঢ় করার জন্য। এই যাত্রা এক বছর আগে উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্ফরনগরে হিন্দু নেতাদের অধিবেশনের আয়োজন করেন মাননীয় অশোক সিংহলজি। এই অধিবেশনের সভাপতি পদ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা গ্রহণ করেন এবং সাংসদ দাউদয়াল খান্না প্রস্তাব রাখেন যে অযোধ্যার রাম জন্মভূমিকে মুক্ত করা হোক। ওঁনার এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে পাশ করা হয়। তারপর রাম জন্মভূমি আন্দোলন শুরু হয় এবং প্রমাণ হয় যে, যখন হিন্দু সমাজ নিজেদের অধিকারের জন্য সংগঠিত হয়ে লড়াই করে, তখন বিজয় অবশ্যই অর্জন করে। অশোকজি বলতেন, 'ভারত শ্রীরাম এবং শ্রীরামই ভারত'। এর প্রমাণ দেখা গেছে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জনসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৯১, তা নেমে ২ হয়েছিল, ১৯৮৪ সালে। যখন ভারতীয় জনতা পার্টি হিন্দুত্বকে ছেড়ে গান্ধীজির সমাজবাদের নীতি গ্রহণ করেছিল।

অন্যদিকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী প্রকটভাবে মুসলিম তুষ্টিকরণের নীতি অবলম্বন করেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের সাহবানো কেসের নির্ণয়কে বদল করার জন্য সংবিধান সংশোধন করালেন, সালমান রুশদির 'দ্য শ্যাটানিক উহেশেশ' ভারতে প্রকাশনকে ব্যান করে দেন। এই সবের প্রতিবাদে হিন্দুদের মনে ক্ষোভ জমা হয়েছিল, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। অন্যদিকে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় কোর্টের আদেশে রাম জন্মভূমির দ্বার হিন্দুদের পূজা-অর্চনা করার জন্য খুলে দেওয়া হয়। এটি ছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রথম আইনি বিজয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে হিমাচল প্রদেশের পালামপুর অধিবেশন থেকে

রাজীব গান্ধীকে বলা হয় হিন্দুদের আস্থার মুখ্য জায়গাগুলো যেন অবিলম্বে হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, অন্যথায় দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করা হবে। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দুদের উপর ঘটা অন্যায়কে তুলে ধরার জন্য লাল কৃষ্ণ আডবাণীজির নেতৃত্বে সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত 'রাম রথযাত্রা' শুরু করা হয়। এই রাম রথযাত্রা অত্যন্ত সফল হয়।

এরপরেই অশোক সিংহলজির নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে রাম জন্মভূমির উপর মন্দির নির্মাণ করার জন্য শিলা পূজার আয়োজন করা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে শ্রীরাম অঙ্কিত ইট বিধিমত পুজো করে অযোধ্যায় পাঠানো হয়। শুরুতে রাজিব গান্ধীর সরকার এই শিলা সংগ্রহ করে রামঘাটে পূজাকে বিরোধিতা করেন। কিন্তু হিন্দু জনমানসের চাপে বাধ্য হয়ে তিনি শিলা পূজনের অনুমতি প্রদান করেন। প্রচন্ড উৎসাহের সঙ্গে শিলার পূজন সমাপ্ত হয়। পরের বছরই সিংহলজি মন্দির নির্মাণের জন্য কারসেবার আহ্বান করেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোলায়ম সিং যাদব সমগ্র জেলাতে অশোক সিংহলজির প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু অশোক সিংহলজি পুলিশের বড় আধিকারিকের ছদ্মবেশে অযোধ্যায় প্রবেশ করেন এবং হাজার হাজার কারসেবকদের নিয়ে জন্মস্থানের দিকে যাত্রা শুরু করেন। অশোকজির মাথায় পুলিশ লাঠি দিয়ে আঘাত করে, কিন্তু অশোকজি তাঁর যাত্রা বন্ধ করলেন না। পুলিশ তখন গুলি চালায়, ফলে প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু হয় এবং অনেকেই আহত হয়। পশ্চিমবঙ্গের দুই ভাই রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী তাঁদের সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছিল। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর পুনরায় কারসেবা শুরু হয় এবং মাত্র ৬ ঘন্টার মধ্যে বিতর্কিত ঢাঁচা গুঁড়িয়ে রামলালাকে অস্থায়ী টেন্টের মধ্যে বিরাজমান করানো হয়। অশোক সিংহলজি ঢাঁচা ফেলার জন্য কখনো অনুতাপ করেননি, বরং ওই দিন নিজের জীবনের সবথেকে বড় পাওনা বলে থাকতেন। অশোক সিংহলজির নেতৃত্বে সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রয়াসে গত ২২শে জানুয়ারি ২০২৪ রাম জন্মভূমির উপর রামলালার ভব্যমন্দির নির্মাণ করতে সফলতা অর্জন করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব সংগঠন বজরং দলের একটি বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই অধিবেশন ১ লাখের বেশি যুবকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখান থেকে অশোকজি বলেন, 'গায় নেহি কাটনে দেঙে, দেশে নেহি বাটনে দেঙে' এবং ব্যাপকভাবে অযোধ্যার রাম মন্দির মুক্তির আন্দোলন শুরু করার জন্য আহ্বান করেন। ওই সময় কাশ্মীরে অমরনাথ যাত্রাকে বন্ধ করার জন্য জিহাদীরা প্রয়াস শুরু করেছিল। তখন অশোক সিংহলজি সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ থেকে ৫০ হাজার বজরংগী যুবকদের কাশ্মীরে পাঠান। তারপর থেকেই বজরং দল বুড়া অমরনাথ যাত্রা প্রতি বছরই করে থাকে।

২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ইউ.পি.এ সরকার 'সেতু সমুদ্রম শিপিঙ কেনাল' প্রজেক্টের মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নির্মিত সেতুকে ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কংগ্রেস সরকার প্রভু রামচন্দ্রকে একটি কাল্পনিক চরিত্র বলে তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এই নিয়ে হলফনামা দিয়েছিলেন আদালতে। হিন্দুদের আস্থাকে তাঁরা কোন আমলই দিতে চাননি। তখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আহ্বানে সাধু-সন্ত সমাজ ও সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ধ্বংস করাকে রুখে দিয়েছিল। সম্পূর্ণ দেশ থেকে ৩৬ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতিকে পত্র পাঠানো হয়েছিল। রাম সেতুর রক্ষার জন্য দেশব্যাপী রাস্তা রোকো আন্দোলন করা হয়েছিল। জন-আন্দোলনের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত সরকার এই সনাতনী আস্থার ধ্বংস থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অনুসূচিত জাতির নেতা সুরজভান আহবান করেন জাতিসূচক শব্দ ব্যবহার বন্ধ করা হোক। এটির সমর্থনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ধর্মাচার্য, সন্ত, মহন্ত মহামন্ডলেশ্বরজিদের একটি সম্মেলনের আহ্বান করে হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচলিত জাতীয় অস্পৃশ্যতার রীতিকে বিনাশ করার সংকল্প নেয়। বিধর্মীদের দ্বারা বাস্তব পরিচয় লুকিয়ে হিন্দু মহিলা ও যুবতীদের ফাঁসিয়ে লাভ জিহাদের ষড়যন্ত্রকে দুর্গা বাহিনী ও বজরং দলের সদস্যরা আটকানোর কাজ করে চলেছে। ধর্ম প্রসার আয়ামের মাধ্যমে বিগত কয়েক বছরে ৬১ লক্ষ হিন্দুদের ধর্মান্তরণের কাজকে রুখে দেওয়া গেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৩২ প্রকার আয়ামের দ্বারা আজ সংগঠন এক বট বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। 'ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ' বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বোধবাক্য এবং বটবৃক্ষ আমাদের প্রতীক চিহ্ন। গোটা বিশ্বে ৮০টি দেশে সম্পর্ক এবং ৫০টি দেশের সমিতি রয়েছে পরিষদের। সমগ্র দেশে ১০০০০ সমিতি, ২৮০০০ সৎসঙ ৮০০০ ছোট বড় সেবা প্রকল্প, ১০০০ বস্তিতে সংস্কার শালা

চালাচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিভিন্ন কার্য বিভাগ ও আয়ামের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে কাজ করে চলেছে। যেমন—বজরঙ্গ দল, দুর্গাবাহিনী, মাতৃশক্তি, সেবা বিভাগ, ধর্মচার্য সম্পর্ক বিভাগ, ধর্ম প্রসার বিভাগ, অর্চক পুরোহিত এবং মঠ ও মন্দির বিভাগ, বিশেষ সম্পর্ক বিভাগ, সামাজিক সমরসতা বিভাগ, সংস্কৃত ভাষা প্রচার প্রসার বিভাগ, বিধি প্রকোষ্ঠ, গো রক্ষা ও সম্বর্ধন বিভাগ, প্রচার প্রসার বিভাগ, বিদেশ বিভাগ, বিমর্ষ বিভাগ, ধর্মযাত্রা বিভাগ, নিধিবিধি বিভাগ, কার্যালয় বিভাগ, সৎসঙ বিভাগ বিবিধ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ইতিহাস বড়ই চিত্তাকর্ষক। পন্থ, ভাষা, সম্প্রদায় এবং জাত-পাতের অভিমানের ঊর্ধ্বে উঠে সনাতনী সমাজ তাঁর একমাত্র পরিচয় যে 'হিন্দু', তা উপলব্ধ করতে শুরু করেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একমাত্র মন্ত্র হল—

হিন্দুবঃ সোদরাঃ সর্বে, ন হিন্দু পাতিতো ভবেৎ।
মম দীক্ষা হিন্দু রক্ষা, মম মন্ত্রঃ সমানতা। ■

পরিষদ বার্তা

## অখিল ভারতীয় প্রচার-প্রসার বিভাগ বৈঠক

গত ২৫ ও ২৬শে জুলাই গুজরাট প্রান্তের সুরাট শহরে ২ দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় প্রচার প্রসার বিভাগের বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি বিশিষ্ট আইনবিদ শ্রীঅলোক কুমারজি, কেন্দ্রীয় সহ মহামন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্র জৈন, কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী ও প্রচার বিভাগের প্রধান বক্তা শ্রীবিজয় শংকর তিওয়ারি, সোশ্যাল মিডিয়া প্রভারী শ্রীরাকেশ পান্ডে এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবক্তা শ্রীবিনোদ বনসল, হিন্দু বিশ্ব-র সহ-সম্পাদক মুরলিশরণ শুক্লা তথা অন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সদস্যগণ। পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত থেকে, বিশ্ব হিন্দু বার্তার সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর, সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত বিশ্বাস, প্রচার প্রসার প্রমুখ শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রচার প্রমুখ শ্রীঅরিন্দম কর, সোশ্যাল মিডিয়া প্রমুখ শ্রীঋষি সতপতি, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত থেকে প্রচার প্রসার প্রমুখ শ্রীশৈবাল বিশ্বাস, সোশ্যাল মিডিয়া প্রমুখ শ্রীঅখিলেশ প্রসাদ, ত্রিপুরা প্রান্ত থেকে শ্রীঅমলকান্তি দাস প্রমুখরা। এই বৈঠকে সুদূর অরুণাচলপ্রদেশ, আসাম থেকে যেমন প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন, তেমনি তামিলনাড়ু, কেরালা সহ ২৬টি প্রান্তের প্রতিনিধিদের উপস্থিত ছিল। এই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়, তার মধ্যে প্রধানত রামমন্দিরের ভক্তদের দ্বারা প্রদান করা রাশির গণনার সময় অনিয়ম, ককরোচ জনতা পার্টির যন্তর মন্তরে আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খল সৃষ্টির চেষ্টা, লাভ জিহাদের দ্বারা ধর্মান্তরের চেষ্টা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিরোধীদের দ্বারা যে ধরনের ন্যারেটিভ তৈরি করা হচ্ছে, তা কিভাবে মোকাবিলা করা দরকার, সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে মোট ১৮টি ভাষাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপত্র আছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু বার্তার প্রসার সবার অধিক বলে অভিনন্দন জানানো হয়েছে এই বৈঠকে। কর্ণাবর্তী গুজরাত প্রান্তের সদস্যদের আতিথিয়তা ছিল মুগ্ধ করার মতো, তাদের অবশ্যই অভিনন্দন জানানো দরকার।


***With best compliments from :***

**Office : 2235-1958 / 1806 / 0274**
**Fax : 033 2221-5682**
**Mobile : 9331028287, 9831121625**

**VISHAL BOTHRA ● VINEET BOTHRA**

**LAB EQUIPMENTS & CHEMICALS (INDIA)**

*Scientific Instruments, Apparatus, Equipments & Chemicals for Laboratories*

**11, POLLOCK STREET (7th FLOOR), KOLKATA-700001**
**E-mail : labquipindia@gmail.com, Website : www.labquipindia.com**

# ভারতীয় রাজনীতির উপর রাম জন্মভূমি মুক্তির আন্দোলনের প্রভাব

ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনীতির উপর রাম জন্মভূমির মুক্তির জন্য বিভিন্ন আন্দোলন সব সময়ই বিশেষ প্রভাব রেখেছিল। মোঘল আক্রান্তা বাবরের আক্রমণ থেকে সুপ্রিম কোর্টের নির্ণয় পর্যন্ত প্রায় ৫০০ বছর এই বিষয়ে নিরন্তর সংঘর্ষ চালু রেখেছিল হিন্দু সমাজ। দশম শতাব্দীর মুসলিম লেখক অল বিরুনি থেকে উনিশ শতাব্দী পর্যন্ত মোহাম্মদ আল্লামা ইকবাল, তাঁদের লেখনিতে বলেছেন, শ্রীরাম হিন্দু সমাজ এবং ভারতবর্ষে কেবলমাত্র ধার্মিকই নয়, রাজনীতিরও মানবিন্দু ধরে আছেন। তাই যতক্ষণ না ভারতীয় সমাজের এই মানবিন্দুকে নষ্ট না করা হবে, ততক্ষণ ভারতের উপর নিজের অধিকার প্রতিস্থাপিত হবে না। এই ভাবনা যুক্ত হয়েই মুঘল সম্রাট বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব বারংবার রাম জন্মভূমিকে নষ্ট করার প্রয়াস করেছিল। যদিও তাদের এই মনস্কামনা কখনো পূর্ণরূপে সফল হয়নি। মুঘলদের পরও একই মানসিকতায় রাম জন্মভূমির উপর আক্রমণ হতেই থাকে।

উনিশ শতকে ইংরেজ দ্বারা ভারতবর্ষের উপর শাসন পূর্ণরূপে স্থাপিত হওয়ার পর, তারা রাজ ক্ষমতাকে দৃঢ় করার জন্য এই বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারে। হিন্দু ও মুসলিম সমাজ একসঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে যাতে সংঘটিত না হতে পারে তার জন্য ইংরেজরা রাম জন্মভূমির বিষয়টি সমাধান হতে দেয়নি। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার হনুমান গড়ি এবং রাম জন্মভূমির উপর মুসলমানের শাহ গোলাম হোসেন এবং মৌলবি আমির আলি আমেঠাবীর নেতৃত্বে জিহাদীরা আক্রমণ করে এবং যৌথ হিন্দু সমাজের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু ইংরেজরা মধ্যস্থতার নামে বিবাদ জিইয়ে রেখে দেয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফৌজাবাদের ইংরেজদের বিচারপতি পি.ডি চামীয়ার বলেন যে, ৩৫০ বছর আগে মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ হয়েছে, সেই ভুলকে আজকে কিভাবে শোধরানো যাবে? তাই যথাস্থিতি বজায় থাকবে। রাম জন্মভূমির বিবাদ সহ আরো অনেক বিবাদকে ইংরেজরা ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার আগে পর্যন্ত কোন সমাধান করে দেননি। স্বাধীনতার পরে ৭০ বছর ধরে এই সমস্ত বিষয় রাজনীতির উপর প্রভাব রেখে চলেছে।

স্বাধীনতার আগে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 'অখিল ভারতীয় রামায়ণ মহাসভা' নামে একটি সংগঠন স্থাপিত করেন। এই সংগঠন বিভিন্ন সময়ে সরকারের সঙ্গে অনুনয়পূর্বক পত্রাচার করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আইন মাফিক আন্দোলন শুরু করা হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সত্যাগ্রহ করা হয়, কিন্তু তখন স্বাধীনতার জন্য তীব্র লড়াই শুরু হওয়াতে ওই প্রয়াস ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর রামায়ণ মহাসভা সোমনাথ মন্দির পুনঃনির্মাণের সঙ্গে অযোধ্যার রাম জন্মভূমির উপর রাম মন্দির নির্মাণের জন্য সত্যাগ্রহ শুরু করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজির হত্যার কারণে এই আন্দোলন কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় রাম জন্মভূমির আন্দোলন একটি রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে আচার্য নরেন্দ্র দেব কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠন করে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নরেন্দ্র দেব বলেছিলেন আমরা সমাজবাদীরা ভগবান মানি না। উল্টোদিকে প্রান্তের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ওদের 'ভগবান মানি না' বাক্যকে প্রয়োগ করে উপনির্বাচনের (১৩টি) আসনে লড়েন এবং বলেন, 'এই নির্বাচন শ্রীরামের বিরুদ্ধে রাবণের সংঘর্ষ।' কংগ্রেস পার্টি সন্ন্যাসী বাবা রাঘব দাসকে অযোধ্যার প্রার্থী করেন, যিনি ২২/২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে অর্ধ-রাত্রিতে অযোধ্যার সেই ঢাঁচার মধ্যে রামলালার মূর্তি স্থাপনে অগ্রসর হয়েছিলেন। ওঁনাকে সামনে রেখে রামচন্দ্রের দৈবত্বকে কেন্দ্র করে নির্বাচন লড়েছিল কংগ্রেস পার্টি এবং সবকটি (১৩টি) আসনে জয়লাভ করে, অর্থাৎ কংগ্রেস পার্টি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে অবলম্বন করে রাজনীতি শুরু করেছিল সেই সময়।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সাহবানোর কেসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর সমস্ত মুসলিম সমাজ আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে। ওদের শান্ত করার জন্য তখনকার প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সংবিধান সংশোধনের পথে যান। মুসলিম সমাজের তুষ্টিকরণ নীতি দেখে সাধারণ হিন্দু সমাজের মধ্যে ক্ষোভ

দেখা দিল। হিন্দুদের ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য রাজীব গান্ধীর সহকারীরা অযোধ্যার রাম জন্মভূমির উপর থাকা রামলালার মন্দিরের তালা খুলে দেওয়ার জন্য বলেন। হিন্দুদের মধ্যে জন জাগরণের কাজ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ করে চলেছিল। একইভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে রামশীলা পূজন করা শীলা (ইট) অযোধ্যায় পৌঁছালে, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে চাপে পড়ে সংকল্পিত রাম মন্দিরের শিলান্যাসের অনুমতি দিয়েছিল রাজীব গান্ধীর সরকার। অযোধ্যার রাম জন্মভূমি মন্দিরের বিষয় রাজীব গান্ধীর কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের নির্বাচনের ঘোষণা পত্রে রামরাজ্য স্থাপনের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় নির্বাচনের শুভারম্ভ অযোধ্যা থেকেই শুরু করেছিল কংগ্রেস। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের ঘোষণাপত্রে রাম জন্মভূমির উপর ভব্য মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। জনসাধারণ কংগ্রেসের উপর ভরসা রাখেনি, তাই যে কংগ্রেস ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৪১৪টা আসন পেয়েছিল, সেই কংগ্রেস মাত্র ১৯৭টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে যে বিজেপি মাত্র ৭.৭৪% ভোট পেয়ে মাত্র ২টি আসন জয়লাভ করেছিল, সেই বিজেপিই ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ১১.৩৬% ভোট পেয়ে ৮৬টি আসন জয়লাভ করে। বাস্তবে কংগ্রেসের দুই নৌকায় পা রাখার জন্যই হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

স্বাধীনতার পর এটা ভাবা হতো যে, হিন্দু সমাজ ধার্মিক উৎসব ইত্যাদিতে একত্রিত হয়, কিন্তু সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে কখনো এক হতে পারে না। আর. এস. এস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাম জন্মভূমি মুক্তির আন্দোলনকে খুব ছোট করে দেখা হতো। কিন্তু ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর সবাই বুঝতে পারে যে, হিন্দু সমাজ যখন এক হয়, তখন পরিবর্তন আসে। কিন্তু এই হিন্দু জনমতকে ভাঙবার রাজনীতি শুরু হয়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী বি.পি.সিংহ মন্ডল আয়োগের রিপোর্টের ভিত্তিতে, নীচু জাতি, উঁচু জাতির বিভেদ শুরু করে ভারতবর্ষকে অস্থির করে তোলে। অন্যদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সংঘ বিচার পরিবার রাম জন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনের দ্বারা হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করে সংগঠিত করার প্রয়াস শুরু করে। এই সময়ের রাজনীতিকে মন্ডলের বিরুদ্ধে কমন্ডলু বলা হয়। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৯। এই ১০ বছরের মধ্যে দেশে চারটি লোকসভা নির্বাচন হয়। আবার ওই ১০ বছরের মধ্যেই অযোধ্যার দুটি কার সেবা হয়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বিবাদিত ঢাঁচা মানুষের দ্বারা ফেলা হয়। এই সময়কালে কংগ্রেস পার্টির সংসদদের সংখ্যা ১৯৭ থেকে নেমে ১১৪ এসে দাঁড়ায়। অন্যদিকে বিজেপি সংসদের সংখ্যা ৮৫ থেকে বেড়ে ১৮২-তে পৌঁছে যায়। স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে এন.ডি.এ জোট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসে। কিন্তু রাম মন্দির না হওয়ার কারণে, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বিজেপি ১৮২ থেকে নেমে ১৩৮-এ চলে আসে এবং কংগ্রেস ১৪৫ আসনে পৌঁছে যায়। ২০০৪ থেকে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে শাসন চালান। উক্ত ১০ বছরে কংগ্রেস শাসন দুর্নীতির আখড়া হয়ে ওঠে।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বিজেপি হিন্দুত্ববাদী চেহারা নিয়ে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নির্বাচনে ৩১.৩৪% ভোট পায় এবং ২৮৩টি আসন পেয়ে এককভাবে ক্ষমতা লাভ করে। যদিও বিজেপি সমস্ত এন.ডি.এ পার্টিকে সঙ্গে নিয়েই শাসন চালায়। কংগ্রেস পার্টি ১৯.৫২% ভোট পেয়ে ৪৪টি আসন পায়। আবার ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে বিজেপি একক ভাবেই ৩০৩টি সাংসদ পায়, ৩৭.৩৬% ভোট প্রাপ্ত করে। ভারতবর্ষের নির্বাচনে এই প্রথম কোন অ-কংগ্রেসি সরকার পরপর দুবার নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছিল। বাস্তবে ২০১৪ এবং ২০১৯-এর নির্বাচন প্রমাণ করে যে, রাম জন্মভূমি বিষয়ক আন্দোলন ভারতীয় জনসাধারণের মনে রেখাপাত করতে পেরেছিল। তাই রাষ্ট্রবাদ ভারতীয় রাজনীতির দিশাকে পূর্ণরূপে বদলে দিতে সমর্থক হয়েছিল। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের রায়দানের ফলে রাম জন্মভূমির উপর ভব্য রামমন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত হয়েছিল এবং ২২শে জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে রামলালার ভব্য মন্দির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির করকমলে উদ্বোধন হয়েছে। বাস্তবে এটিকে দীর্ঘ আন্দোলনের নিখাদ পরিণাম বলেই ভাবা উচিত।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি রামলালার মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী প্রতিদিন দর্শন করতে এসে প্রণামী হিসেবে টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা সমর্পিত করেছেন, যার দ্বারা

মন্দির এবং আশেপাশের অঞ্চলের সংরক্ষণের কাজ চালানো হচ্ছে। অযোধ্যাতে রামভক্তদের আগমনের ফলে স্থানীয় মানুষদের রোজগার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা হিন্দু সমাজের এই তীর্থস্থানটির জন্য গর্ব অনুভব করছেন। কিন্তু বিরোধী দলের নেতারা মন্দিরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, স্থানীয় লোকের সুখ সমৃদ্ধি এবং সনাতনীদের সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধারকে কোন মতেই মেনে নিতে পারছেন না। সম্প্রতি স্টেট ব্যাংক দ্বারা নিয়োজিত কিছু সেবাদার মন্দিরের দানপাত্র থেকে সংগৃহীত টাকা গণনার স্থানে ছলনা করে অর্থ চুরি করেছে, যা অত্যন্ত নিন্দার বিষয় এবং ট্রাস্টের অভিযোগের ফলে সেইসব ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ট্রাস্টিদের প্রয়াসে ৮০ লক্ষ টাকা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। সরকার SIT গঠন করেছে এবং যারা ওই গর্হিত কাজে যুক্ত, তাদের সকলের উপর আইন মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। SIT নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে, যা সুপ্রিম কোর্টও বলেছে। কিন্তু বিরোধী দলগুলো অনর্গল মিথ্যা প্রচার করেই চলেছেন এবং ২০ হাজার কোটি টাকা তছরূপের কথা বারংবার প্রচার করছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি শ্রীআলোক কুমারজি একজন বলিষ্ঠ উকিল হিসেবে শ্রীরাম জন্মভূমির থানার ডি.এস.পি-কে পত্র লিখে রামগোপাল যাদব, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সঞ্জয় সিংহ, প্রিয়াংকা গান্ধী প্রমুখের কাছ থেকে অভিযোগ সমর্থিত দস্তাবেজ চেয়েছেন, যা তারা দিতে পারেননি অর্থাৎ সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বাস্তবে সেক্যুলার রাজনীতিবিদরা চাইছেন যেন-তেন প্রকারে হিন্দু মন্দিরগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণে রেখে সমর্পিত অর্থকে বিধর্মীদের জন্য ব্যয় করা যেন অব্যাহত থাকে। ওদের রাজনীতিই হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতির উপর আঘাত করার উপর নির্ভরশীল। এই কারণে তারা হিন্দু সমাজের নতুন উর্জা কেন্দ্র এবং একতার প্রতীক রামমন্দির (জন্মস্থান)-কে অপবিত্র করতে চাইছে। তাছাড়া রাম বিরোধীরা চাইছেন অযোধ্যার রাম মন্দিরকে বদনাম করে কাশী, মথুরায় মন্দির মুক্তির প্রয়াসকে আটকে দিতে। এই সময় সমগ্র হিন্দু সমাজকে ধৈর্য্য এবং শান্তি বজায় রেখে বিরোধীদের ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করতে হবে। বাস্তবে আজও ভারতবর্ষের বিরোধী দলের রাজনীতি অযোধ্যা, কাশী, মথুরা মন্দির মুক্তি আন্দোলনকে রুখবার জন্যই চলেছে। তাই সনাতনী সমাজকে জাগ্রত ও সতর্ক থাকতে হবে। ■

## পরিষদ বার্তা

### দুই দিবসীয় নদীয়া দক্ষিণ জেলা কার্যকর্তা, প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ১৩ ও ১৪ জুলাই ২০২৬ নদীয়া দক্ষিণ জেলার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুই দিবসীয় জেলা কার্যকর্তা, প্রশিক্ষণ বর্গ। উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী সত্রে শ্রীবিজয় কুমার পাতর (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক)। শ্রীসুজিত সাহা (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সহ সৎসঙ্গ প্রমুখ), শ্রীসুজিত মিত্র (নবদ্বীপ বিভাগ সম্পাদক) এবং সমারপ কার্যক্রমে ছিলেন শ্রীস্বপন কুমার মুখার্জি (কেন্দ্রীয় সহ সেবা প্রমুখ) ও অন্যান্য জেলাস্তরীয় কার্যকর্তাগণ।

### কাঁচরাপাড়া প্রখণ্ডের উদ্যোগে চক্ষু সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

১২ জুলাই ২০২৬ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কাঁচরাপাড়া প্রখণ্ডের উদ্যোগে নীচুবাসা ইড.পি. প্রাইমারী স্কুলে একটি বিনামূল্যে চক্ষু সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে কলকাতার তিনজন এবং কাঁচড়াপাড়ার তিনজন—মোট ছয় জন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। এবং স্থানীয় মোট ৮০ জন এই শিবিরের পরিষেবা গ্রহণ করেন।

### বজরঙ্গ দল সেবা সপ্তাহ

বহরমপুর গান্ধি কলোনী জংলি বাবা আশ্রমে বজরঙ্গ দলের উদ্যোগে ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের (NMO) ডাক্তারবাবুদের সহযোগিতায় বজরঙ্গ দল বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করবে।

### শোক সংবাদ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্ম প্রসার বিভাগের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত পরিযোজনা প্রমুখ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকারের মাতৃদেবী সুকিতা সরকার গত ১৭ই জুন বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সাধনোচিত পরমধামে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দুই পুত্র, বৌমা, নাতি-নাতনী ও অনেক আত্মীয়স্বজন রেখে গেলেন।

# স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

প্রোজ্জ্বল মণ্ডল

উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের সূচনালগ্নে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের লড়াই নয়; তা ছিল জাতীয় আত্মচেতনাবোধের জাগরণ, সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন এবং সামাজিক মর্যাদার পুনরুদ্ধারের এক বিস্তৃত আন্দোলন। দীর্ঘকালীন ঔপনিবেশিক শাসণের কারণে যে হীনমন্যতা ও পরাধীনতার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভাঙার কাজে স্বামী বিবেকানন্দ এক শক্তিশালী অনুপ্রেরণাস্রোত হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি সরাসরি রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো নেতৃস্থানীয় অবস্থান অধিকার না করলেও তাঁর জীবনদর্শন, বাণী ও নৈতিক চিন্তা স্বাধীনতা আন্দোলনের মানসিক ভিত্তি গঠনে মৌলিক ভূমিকা রেখেছে। তাই তাঁকে কেবল একজন ধর্মগুরু বা সন্ন্যাসী বলে সীমাবদ্ধভাবে দেখলে ইতিহাসের ন্যায্য মূল্যায়ন হয় না; তিনি ছিলেন জাতির মানসিক পুনর্গঠনের এক প্রধান উদ্‌বোধক।

বিবেকানন্দের শিক্ষা ছিল আত্মশক্তি, কর্মশক্তি ও মানব-মর্যাদার ওপর জোর দেওয়া। তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো জাতি তখনই উন্নত হয় যখন তার মানুষ নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং পরাধীন মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারে। তাঁর বিখ্যাত আহ্বান, 'উঠো, জাগো এবং লক্ষ্যপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত থেমো না'; যা কঠোপনিষদের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত' শ্লোকের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত; কেবল আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা নয়, জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও এক জাগরণমন্ত্রে পরিণত হয়। এই উক্তি তরুণ সমাজকে ক্রিয়াশীল হতে, থেমে না থাকতে এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় হতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বিবেকানন্দ স্বাধীনতাকে কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তি হিসেবে সীমাবদ্ধ দেখেননি; তিনি বলেছিলেন, "স্বাধীনতা সমগ্র বিশ্বজগতের চালিকাশক্তি, আর স্বাধীনতাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য।" এই ভাবনাকে রাজনৈতিক অর্থেও বুঝতে হয়। ভারতীয় জাতির কাছে স্বাধীনতা মানে ছিল শাসকের শৃঙ্খল ছিন্ন করে জাতীয় মর্যাদা ফিরে পাওয়া। তিনি আরও বলেছিলেন, "দুর্বল মানুষের পক্ষে কখনও স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়।" এই উক্তি স্বাধীনতার সংগ্রামে সাহস, শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের অপরিহার্যতার ওপর জোর দেয়। বিবেকানন্দের মতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না; তা অর্জন করতে হয়—আত্মনির্ভরতা, সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। তিনি জাতিকে কেবল ভূখণ্ড বা প্রশাসনিক একক হিসেবে দেখতেন না; তিনি জাতিকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে ধারণা করতেন। তাঁর মতে, "প্রতিটি জাতিরই পৃথিবীর প্রতি একটি দায়িত্ব আছে, একটি বাণী আছে, একটি লক্ষ্য আছে।" এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতবর্ষকে পরাধীন ভূখণ্ড নয়, বরং মানবসভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি আরও বলেছিলেন, "নিজ জাতির কল্যাণেই মানুষের নিজের কল্যাণ নিহিত।" এই ভাবনায় নৈতিকতা, শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অঙ্গীভূত করা হয়।

তরুণ সমাজের প্রতি বিবেকানন্দের আস্থা ছিল অগাধ। তিনি বলেছিলেন, "আমার বিশ্বাস তরুণ প্রজন্মের ওপর।" এই বিশ্বাস ছিল স্বাধীনতা-চেতনার শক্তির অন্যতম উৎস। তিনি জানতেন, সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে হলে তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সাহস ও কর্তব্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। তাই তিনি বলতেন—বড় উদ্যোগ, সীমাহীন সাহস, প্রচণ্ড শক্তি এবং সর্বোপরি নিখুঁত আনুগত্য; এই গুণগুলো ব্যক্তি ও জাতির পুনর্জাগরণের পথ দেখায়। এখানে শক্তি কেবল শারীরিক ক্ষমতা নয়; এটি নৈতিক দৃঢ়তা, আদর্শনিষ্ঠা ও সংগঠনশক্তি। এই মনোভাব পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের যুবসমাজকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করেছে।

শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর বিবেকানন্দ গভীর জোর দিয়েছিলেন। "গরিব ছেলেটি শিক্ষার কাছে আসতে পারে না, তাই শিক্ষা গরিবের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।"—এই বক্তব্য সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার কথা বোঝায়। স্বাধীনতাকে তিনি শুধু রাজনৈতিক অধিকার পুনরুদ্ধার হিসেবে দেখেননি; তিনি এটিকে সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষা, মর্যাদা ও মানবিক উন্নয়নের আন্দোলন হিসেবে দেখেছিলেন। নারীর মর্যাদার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কোনো জাতি কতটা উন্নত, তা বোঝা যায় সেই জাতি নারীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে।" এটি স্পষ্ট করে দেয় যে তাঁর চিন্তা পুরুষতান্ত্রিক শক্তির আহ্বান নয়; বরং সমগ্র মানবসমাজের উন্নয়নের আহ্বান।

স্বামীজির বাণী ও জীবনদর্শন বিপ্লবীদের মধ্যে গভীর

প্রভাব ফেলেছিল। বাল গঙ্গাধর তিলকের ঘনিষ্ঠ মহলের 'মারাঠা' পত্রিকায় ১৯১২ সালে তাঁকে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত জনক' বলা হয়। এই মূল্যায়ন কেবল আবেগপ্রসূত নয়; এতে রাজনৈতিক ও মানসিক প্রভাবের স্বীকৃতি ছিল। অরবিন্দ ঘোষ বলেছেন, ''এই যুগের আদর্শ হল গতিশীল রূপান্তর, আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষাই ইতিমধ্যেই তার আগমনবার্তা ঘোষণা করেছে।'' অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনের রূপান্তরের সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল।

ব্রিটিশ প্রশাসনও বিবেকানন্দকে গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিল। কলকাতা পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রধান চার্লস টেগার্ট ১৯১৪ সালের একটি গোপন রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দকে রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি লিখেছিলেন যে বিবেকানন্দের শিক্ষা আজকের বিপ্লবী যুবকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এবং তাঁর উক্তি-রচনা যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী মানসিকতা সৃষ্টি করছে। লন্ডন পুলিশের রিপোর্টেও তাঁকে রাজনৈতিক-ভাবে আগ্রহী সন্ন্যাসী বলা হয়। এই পর্যবেক্ষণই প্রমাণ করে যে ব্রিটিশরা উপলব্ধি করেছিল—বিবেকানন্দ কেবল আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন না; তিনি জাতীয় চেতনার গভীর প্রভাবশালী ছিলেন।

বিবেকানন্দের জীবদ্দশায়ই তাঁর রাজনৈতিক মনোভাব বিভিন্ন স্মৃতিকথায় প্রতিফলিত হয়েছে। হেমচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিতে তিনি বলেছেন, ''আমাদের প্রথম দরকার স্বাধীনতা —রাজনৈতিক স্বাধীনতা'' এবং ইংরেজদের সর্বশক্তি দিয়ে ভারত থেকে তাড়াতে হবে—এই কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা ইঙ্গিত করে যে বিবেকানন্দ ভারতীয় রাজন্যদের নিয়ে এক শক্তিজোট গঠনের কথা ভাবতেন, এমনকি হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গেও যোগাযোগের প্রচেষ্টা করেছিলেন। যদিও সব প্রচেষ্টা সফল হয়নি, তবু এগুলো দেখায় যে তিনি কেবল কথা বলতেন না; তিনি বাস্তবে রাজনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজতে সক্রিয় ছিলেন।

কংগ্রেসের নরমপন্থী কূটনীতি—কেবল সভা, প্রস্তাব ও আবেদন; তার কাছে পর্যাপ্ত নয় বলে বিবেচিত হত। তিনি প্রশ্ন তুলতেন, ''কতকগুলো লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে কেবল কথা বললে কি কাজ হয়?'' এবং কর্মের গুরুত্বের ওপর জোর দিতেন। তাঁর এই মনোভাব পরবর্তী চরমপন্থী ও বিপ্লবী ধারার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল; ফলে তরুণ বিপ্লবীরা তাঁকে অনুপ্রেরণায় গ্রহণ করেছিল। বিপ্লবী সংগঠনগুলো— যেমন অনুশীলন, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স; বিবেকানন্দকে উচ্চ আসনে রেখেছিল। গণেশ ঘোষ ও অন্যান্যদের স্মৃতিকথায় পড়া যায়, বিপ্লবী সাহিত্য- চর্চার পাশাপাশি বিবেকানন্দের রচনাগুলো ও বাণী যুবকদের দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্বাধীনতা-চেতনার বিভিন্ন ধারার নেতা-অনুসারীরাও বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীও তাঁকে সম্মান করতেন; গান্ধীর আত্মজীবনীতে দেখা যায় তিনি বেলুড়ে স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলেন। গান্ধীর অহিংসা-দর্শন ও বিবেকানন্দের শক্তিভিত্তিক আহ্বান একরকম না হলেও দুজনের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, নৈতিক দৃঢ়তা ও দেশের প্রতি নিষ্ঠা ছিল অভিন্ন। এই মিলিত সুরই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা একে অপরকে পরিপূরক করে তোলে।

সবশেষে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সরাসরি সংগঠক না হলেও তিনি ছিলেন এক নীরব, গভীর ও স্থায়ী মানসিক নির্মাতা। তাঁর শিক্ষা মানুষকে শিখিয়েছিল স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন নয়; এটি আত্মশক্তি, নৈতিকতা, শিক্ষা, ঐক্য এবং মানব-মর্যাদারও প্রশ্ন। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'; অর্থাৎ 'উঠো, জাগো এবং লক্ষ্যপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত থেমো না'; আজও ব্যক্তিগত উন্নতি ও জাতীয় পুনর্জাগরণের প্রতীক। 'স্বাধীনতা সমগ্র বিশ্বজগতের চালিকাশক্তি, আর স্বাধীনতাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য'—এই ভাবনা ভারতীয় জাতিকে পরাধীনতার আবরণ ভেঙে আত্মমর্যাদার পথে এগিয়ে যেতে শিখিয়েছিল। 'আমার বিশ্বাস তরুণ প্রজন্মের ওপর'—এই আস্থা স্বাধীনতা আন্দোলনের তরুণ বিপ্লবীদের মধ্যে সাড়া তুলেছিল। 'দুর্বল মানুষের পক্ষে কখনও স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়'; এই উচ্চারণ তাদের সাহস ও সংগ্রামের ভাষা হয়ে উঠেছিল। তাঁর বাণী 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' অর্থাৎ নিজের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জগতের কল্যাণ সাধনের আহ্বান বিপ্লবীদের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে।

বিবেকানন্দকে ইতিহাসে কেবল ধর্মগুরু নয়, বরং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক নীরব কিন্তু গভীর নির্মাতা হিসেবে স্মরণ করা উচিত। তাঁর শিক্ষা ভারতীয়দের শিখিয়েছিল যে স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন নয়; এটি আত্মশক্তি, নৈতিকতা, শিক্ষা, ঐক্য এবং মানবমর্যাদারও প্রশ্ন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বহুমাত্রিক পথে এই শিক্ষা ছিল এক শক্তিশালী ভিত্তি, যা ভারতবাসীকে পরাধীনতা থেকে মুক্তির পথে এগিয়ে দিয়েছিল। ■

# হিন্দুত্বের স্বরূপ

## সুধাংশুকুমার পাত্র

নামের সঙ্গে বহু কিছু জড়িত। 'হিন্দুত্ব' শব্দ বলা মাত্রই তার ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে। প্রাচীন পারসিকরা আবেস্তা পুস্তকে বৈদিক জাতির নাম সপ্তসিন্ধুকে 'হপ্তসিন্ধু' বলে উল্লেখ করেছে। পারসিরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে যে আর্যরা বাস করতেন, তাদেরকে 'হিন্দু' বলে ডাকতেন। সপ্তসিন্ধু হচ্ছে সাতটি নদীর নাম, যথাক্রমে—শতদ্রু, বিপাসা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, সিন্ধু ও সরস্বতী।

সপ্তসিন্ধুর চতুর্দিকে আর্যরা ছড়িয়ে পড়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন জনপদ তৈরি করে, পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করেছিল। সিন্ধু থেকে সমুদ্র পর্যন্ত যে বিশাল জনপদ তাকে আর্যাবর্ত বা ব্রহ্মাবর্ত বলা হত। আর্য-অনার্য সকলে মিলে এক জাতিতে পরিণত হয়েছিল। সারা বিশ্বে হাজার হাজার পণ্ডিত, ধর্মোপদেষ্ঠাগণ ভারতীয় বংশের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্ত বিস্তার করেছিলেন। এই সময় বিশ্ব আমাদেরকে 'হিন্দুস্থানি' নামে অভিহিত করতেন। ভারতখণ্ড, সপ্তসিন্ধু, আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাপথ প্রভৃতি নামে ডাকা হলেও সব চাপা পড়ে গিয়ে 'ভারতখণ্ড' নামে পরিচিত হয়। বিষ্ণু পুরাণে লেখা আছে—

> **'উত্তরং যত সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম।**
> **বর্ষং তদ ভরতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।'**

এই ভারতখণ্ড, মাতৃভূমি ও হিন্দুস্থানের পরিধি আসিন্ধু হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই হিন্দুস্থান আমাদের দেশ ও আমাদের পুণ্যভূমি। এই দেশে জন্মেছেন বৈদিক ঋষি থেকে দয়ানন্দ স্বামী, জিন থেকে মহাবীর, বুদ্ধ থেকে শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, রামদাস, রামমোহন প্রমুখ। এঁনারা আমাদের গুরু ও মহাপুরুষ। ফলে এ দেশের ধূলিকণা পবিত্র হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক হিন্দুর কাছে এই ভারতভূমি হচ্ছে পিতৃভূমি এবং পূণ্যভূমি। এই দেশকে রক্ষা করা ও এই দেশের সংস্কৃতিকে বজায় রাখা প্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য। কেবল তাস খেলে, ভাষণ দিলে, গল্প লিখলে হবে না হিন্দু ধর্মের কিছু সিদ্ধান্ত জানুন ও উপলব্ধি করুন। যথা—

- চতুবর্ণ আশ্রম : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র।
- চার আশ্রম : ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস।
- চার পুরুষার্থ : ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।
- চার বেদ : ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুবেদ, অথর্ববেদ।
- ছয় বেদাঙ্গ : শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, ছন্দ।
- যার উপবেদ : আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ, অর্থভবেদ।
- উপনিষদ : ১০৮টি। তার মধ্যে ১১টি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রামাণিক। যথা—ঈশো, কেন, কঠো, মুন্ডকো, তৈতরীয়, হংস, স্কন্দ, প্রশ্ন, ছান্দোগ্য, মান্ডুক্যে, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর।
- পুরাণ ; ১৮টি। যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, শিব, ভাগবত, নারদ, মারকণ্ডেয়, অগ্নি, লিঙ্গ, ভবিষ্য, ব্রহ্ম বৈবর্ত, কুর্ম, স্কন্দ, বামন, গরুড়, বরাহ, মৎস, বিষ্ণু, ব্রহ্মণ্ড।
- অষ্টাঙ্গযোগ : যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।
- চারধাম : বদ্রীনাথ, রামেশ্বর, দ্বারকা, পুরী।
- **ষোড়শ সংস্কার :**

ক) প্রাক জন্ম সংস্কার—গর্ভধাণ, পুংবসন-সীমন্তোন্নয়ণ।

খ) বিদ্যারম্ভ সংস্কার—জাত কর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন চুড়াকর্ম, কর্ণবেধ।

গ) শৈক্ষণিক সংস্কার—উপনয়ন, বেদারম্ভ, কেশান্ত বা গোদান, সমাবর্তন, বিবাহ।

ঘ) জীবন যাপন—গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, অন্ত্যেষ্টি।

**নারীর স্থান :** ঋকবেদে ও বৃহৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে নারীদের সমান অধিকার বর্ণিত আছে। মহিলার ঋষিদের বলা হতো ঋষিকা বা ব্রহ্মবাদিনী। রোমোসো, লোপামুদ্রা, অপালা, কদ্রু, বিশ্ববারা, ঘোষা, জুহু, পৌলমী, জারিতা, যমী, ইন্দ্রানী, সাবিত্রী, দেবযানি প্রমুখ ঋষিকার নাম পাওয়া যায়। সামবেদে নেপাধা, আকৃষ্টবাস, সীকাতানী, গানপায়না প্রমুখ ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ আছে। হারীত স্মৃতিতে নারীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—ব্রহ্মবাদিনী বা ব্রহ্মচারিণী, তারা বেদ পড়তে পারত, অন্যান্য চিত্রকলা, নান্দনিক বিদ্যা শিখতে পারত। কিছু মহিলা কবি, যেমন—হর্ষবর্ধন ভগিনী রাজশ্রী, রাজশেখরের স্ত্রী অবন্তী সুন্দরী, কাদম্বিনী, মহাশ্বেতা (বানভট্টের রচনায়), কামন্দটা

(ভবভূতির রচনা) প্রমুখকে পাওয়া যায়। বেদ মন্ত্রে নারীর প্রতি আহ্বান—

**বিশ্বাস অস্যা ননাম চক্ষসে জগত, জ্যোতিষ কৃনোতি সুন্দরী।**
**অপহদেবো মযোনী দুহিতা দিব, ঊষা উচ্ছেদ উপ স্রিধঃ।।**

হে রাষ্ট্রের নারী, তুমি দিব্য পিতার কন্যা। তোমার বহুগুণ ঐশ্বর্য আছে। তুমিই পরিবার ও সমাজের দোষ- ত্রুটিকে দূর করতে পার। তুমি নেতৃত্ব দাও, বিশ্ব মানবও শিখবে।

রামায়ণে সীতা, উর্মিলা ও কৈকেয়ী, এই তিন নারীর শক্তি ও কর্তব্য নিষ্ঠা প্রেরণাদায়ক। মীরাবাঈ, রানী পদ্মিনী, জিজেবাঈ, যশোদা মা, সারদাদেবী, মন্দোদরী মা অঞ্জনি বা অহল্যা, দেবী তারা বলির স্ত্রী, মেঘনাথের স্ত্রী সুলোচনা। এই সব নারীর জীবনী পড়লেই নিজের মন, বুদ্ধি, সংযত হয় এবং শক্তি বৃদ্ধি হয়। ■

## শাপমোচন

### সরোজ চক্রবর্তী

রাত জাগা দুটি চোখ স্বপ্ন দেখে চেয়ে চেয়ে,
ঘুমোতে দেয় না.....
চোখের আগল ঠেলে
বেরিয়ে আসে অগণিত সাফল্যের সিঁড়ি.....
সূর্য হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেয়
বিস্মৃতির অতল জলরাশি থেকে.....।
শূন্য থেকে শুরু করে শূন্যে ফেরার তোরজোড়,
শুধু সংখ্যা কয়টি রেখে যাওয়ার কথা....।
কথা দিয়েছিলাম জন্ম মূহুর্তে.....
আজ কথা রাখার পালা।

তোমার সান্নিধ্যে হয়তো
পাষাণী অহল্যার শাপমোচন হবে।

## শৌর্য জাগরণ যাত্রা

### শর্মিষ্ঠা আচার্য্য

শিখিয়েছে ইতিহাস
পৃথিবীতে পদে পদে শত্রুতা।
বিষ বাষ্প ষড়যন্ত্রের কাঁটা,
ডাইনে বাঁয়ে কঠিন খুব হাঁটা
জগৎজোড়া পাঠশালা,
আজীবন শিক্ষা,
যোগ্যতমের উদ্বর্তন।
বন্ধুর উচ্চাবচ ভূমি,
শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্য
এ পথে সকলেই চির একা,
আর অসংখ্য ছদ্ম মিত্রতা।
এর চেয়ে,শিক্ষার্থী হয়ে থাকা;
উঠছে নামছে ঐতিহাসিক চিত্রলেখ,
তাতে আমার কি?
সত্য-ধর্ম, নিষ্কাম কর্ম,
আরাধ্যা-জননী জন্মভূমি
অসমুদ্র হিমাচল, কীট পশু বৃক্ষ নদী
নর নারী মৃত্তিকা পবিত্র দেশমাতা।
বেরিয়ে পড়েছি পথে—
সেবা সুরক্ষা সংস্কার দিতে,
নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যবিধাতা,
গড়ে উঠেছে শৌর্যসেনা;
আমি আমরা—স্বয়ং সেবক সেবিকা।
আরাধ্যা পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র—
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,ললাটে জয়টীকা,
গৈরিক, ঈশ্বরের সেনা,
আমাদের স্বপ্ন আমাদের কেনা।

সেবা সপ্তাহ পালন, ব্যারাকপুর, দক্ষিণবঙ্গ

সেবা সপ্তাহ পালন, চাকদহ, মধ্যবঙ্গ

# আসুন আমরা হিন্দু হই

১৯৫১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, রবিবার পুনেতে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় শ্রীস্বামী চিন্ময়ানন্দের ভাষণের উপর একটি প্রতিবেদন।

সংকলন : শ্রী এস. পি. শর্মা, এফ.টি.এস

সত্যের তীর্থযাত্রী ভাইয়েরা,

কথা বলার জন্য একজন মহাত্মা। পটভূমিতে একটি মন্দির। হিন্দু শ্রোতাদের দ্বারা পরিপূর্ণ একটি সভাকক্ষ, এবং আলোচনার বিষয়, 'আসুন আমরা হিন্দু হই।' অদ্ভুত! এটি প্রায় একটি হাস্যকর হেঁয়ালি এবং একটি অর্থহীন স্ববিরোধ। এবং আমি খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা এই সাধুর দুঃসাহসে বিস্মিত হয়েছেন!

শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে এটি একটি নতুন ফ্যাশন হয়ে উঠেছে যে, যে কোন আলোচনায় তাদের ধর্মের নাম শুনলেই তারা নাক কুঁচকে অবজ্ঞার সাথে বিদ্রূপ করে। ব্যক্তিগতভাবে, আমিও আমাদের ধর্মের এই সমালোচকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু যখন এই অবিবেচক দলটি ঘোষণা করতে শুরু করে যে আমাদের পবিত্র ধর্ম থেকে পালিয়ে গেলে আমরা সামাজিকভাবে এবং জাতীয়ভাবে লাভবান হব, তখন আমি আমার নিজের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে থাকি।

আমাদের দেশের বর্তমান নৈতিক, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের অবস্থায় ধর্মকে পুরোপুরি বর্জন করা আমাদের ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করবে। আমাদের ধর্ম যতই অধঃপতিত হোক না কেন, একেবারেই কোন ধর্ম না থাকার চেয়ে তা অনেক ভালো। আমার প্রস্তাব এই যে, বিচক্ষণ কাজ হবে যদি আমরা হিন্দুধর্মের একটি নবজাগরণ ঘটানোর চেষ্টা করি, যাতে বহু শতাব্দী ধরে প্রমাণিত এর মহত্ত্বের ছায়ায় আমরা সংস্কৃতি ও সভ্যতার সেই সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারি, যা আমাদের ঐতিহাসিক অতীতে ছিল।

নিঃসন্দেহে, ভারতে হিন্দুধর্ম এখন পবিত্র কিছু কুসংস্কারের সমষ্টি, কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, রান্না, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা ইত্যাদির এক বিশেষ রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের দেবতারা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মতো নশ্বর স্তরে নেমে এসেছেন, যাদের বেদীতে একনিষ্ঠ হিন্দু প্রার্থনা করতে পারে এবং তার কাঙ্ক্ষিত জিনিসের জন্য বিশেষ অনুমতি পেতে পারে—অর্থাৎ, যদি সে পুরোহিতকে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করে!

এই অধঃপতন কোন আকস্মিক ও হঠাৎ ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের ফল নয়। দুশো বছর ধরে হিন্দুধর্ম রাষ্ট্রের কোন পৃষ্ঠপোষকতা এবং ধনীদের সামান্য উৎসাহ ছাড়াই এক অবাঞ্ছিত অনাথের মতো রয়ে গেছে। এক সময় বিদ্বান দার্শনিকরা যথার্থই রাষ্ট্রের উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু উপদেষ্টা শ্রেণী (ব্রাহ্মণ) এবং শাসক শ্রেণী (ক্ষত্রিয়)-র গুণগত মান অধঃপতিত হয়েছে। বিলাসিতা ও ক্ষমতার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত উষ্ণতায় ধীরে ধীরে নিজেদের পচন ঘটিয়ে তারা আমাদের সেই শোচনীয় পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, যেখানে আমরা এখন রয়েছি। শিক্ষিত শ্রেণীর সাধারণ প্রতিবাদ আসলে এই অধর্মের বিরুদ্ধেই। তবে, কেবল অবিবেচক, অজ্ঞ নেতারাই একে হিন্দুধর্ম বলে।

নিশ্চয়ই, যদি হিন্দুধর্ম আমাদের জন্য কেবল হৃদয়হীন লালা (দোকানদার), দুর্নীতিগ্রস্ত বাবু (কেরানি), কাপুরুষ, প্রেমহীন মনিব এবং অবিশ্বস্ত ভৃত্য তৈরি করতে পারে; যদি হিন্দুধর্ম আমাদের কেবল এমন এক সামাজিক জীবন দিতে পারে, যেখানে প্রত্যেক মানুষকে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়, যদি হিন্দুধর্ম আমাদের কেবল অনাহার, নগ্নতা এবং চরম দারিদ্র্য দিতে পারে; যদি হিন্দুধর্ম আমাদের কেবল লুণ্ঠন, লুটপাট এবং চুরি করতে উৎসাহিত করতে পারে; যদি হিন্দুধর্ম আমাদের কেবল অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা, কঠোর হৃদয় এবং নিষ্ঠুরতার শিক্ষা দিতে পারে; তাহলে আমিও চিৎকার করে বলি, 'নিপাত যাক, নিপাত যাক' সেই হিন্দুধর্মের।

তবুও, উপরোক্ত চিত্রটি সেই দুঃখজনক অবস্থা এবং দুর্দশার এক বাস্তব চিত্র, যার মধ্যে হিন্দু জনগণ, একটি জাতি হিসেবে, নিজেদেরকে পতিত হতে দিয়েছে। এটিই বর্তমান ভারতের মহান হিন্দু বিপর্যয়ের মর্মান্তিক চিত্র।

কিন্তু হিন্দুধর্ম সেই বাহ্যিক প্রদর্শনী নয় যা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জাহির করতে শিখেছি। হিন্দুধর্ম

হল এক নিখুঁত বিজ্ঞান। এর মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান রয়েছে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, যে ধর্মকে আমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে শুরু করেছি, তা সেই মহান সত্য হিন্দুধর্ম নয়। এটি কেবল অতীতে কোনো এক সময়ে স্বার্থপর, অহংকারী, ক্ষমতালোভী পুরোহিত শ্রেণীর দ্বারা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এক বিশ্বাসঘাতক চক্রান্ত, যাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে তাদের পরিকল্পনা এবং আমাদের নিজেদের কামনা-বাসনার দাস বানানো। বর্তমানের হিন্দু কলঙ্কিত ব্যক্তিরা হল অতীতের এই ধর্ম-ধ্বংসকারীদের করুণ সাফল্য। আমাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে আমরা আমাদের এমন অনেক বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, যা আমাদেরকে হিন্দুধর্মের মেরুদণ্ড হিসেবে শেখানো হয়। হিন্দুধর্ম হল বেদান্তের ধর্ম, উপনিষদের শাশ্বত ধর্ম।

উপনিষদ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, বাস্তবে মানুষ—তার কৃতিত্বের শিখরে—স্বয়ং ঈশ্বর। তাকে উপদেশ দেওয়া হয় যেন তিনি জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলোকে এমন নিয়মতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাপন করেন, যাতে প্রতি মুহূর্তে তিনি সচেতনভাবে নিজেকে সেইসব অপূর্ণতার আস্তরণ থেকে শুদ্ধ করতে পারেন, যা তার ভেতরের প্রকৃত শাশ্বত সত্তার সৌন্দর্য ও দেবত্বকে আড়াল করার জন্য জমা হয়েছে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার আত্মপ্রচেষ্টায় সচেতনভাবে নিজেকে শুদ্ধ ও বিকশিত করে তার প্রকৃত স্বরূপ ফিরে পেতে পারে, সেটাই হিন্দুধর্মের মূল বিষয়বস্তু। হিন্দুধর্ম তার বিশাল পরিসরে পুরাণ, শাস্ত্র এবং তাদের হাজারো ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার ভাষ্যে থাকা বিশদ বিবরণের আড়ালে সত্যকে সংরক্ষণ ও পূজা করেছে। এই অতিরিক্ত অলঙ্করণ সত্যের এই ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রকৃত সৌন্দর্য ও মহিমাকে এতটাই কার্যকরভাবে আড়াল করে ফেলেছে যে, আজ কলেজ-শিক্ষিত নিরক্ষররা প্রাচীন সংস্কৃত লেখকদের ভাষা ও শৈলী সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণে মন্দিরটিকে তার নিজস্ব অলঙ্করণের মাঝেই দেখতে পায় না।

আমাদের ধর্মের মূল গ্রন্থগুলো অনুসন্ধান করে হিন্দুধর্ম আমাদের কী শিক্ষা দেয় এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা মোকাবিলায় এর বার্তা কীভাবে আমাদের পরিত্রাণে কাজে লাগানো যায়, তা জানার উদ্দেশ্যেই এই শতদিনব্যাপী উপনিষদ জ্ঞান যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা ১৯৫১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পুনেতে শুরু করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ধর্ম মৃত ও নিষ্ফল হয়ে যায়, যদি সাধকরা এর আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে প্রস্তুত না থাকেন। সেই হিসেবে, এমন কোন দর্শন—রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক—কি আছে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তার নীতি অনুসরণ না করেই সাফল্যের সেই প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যেতে পারে?

অতীতে আমাদের সংস্কৃতি যতই মহান হোক না কেন, ইতিহাস বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ সেই মৃত গৌরব আমাদের বর্তমান সংকটে কোন সাহায্য করবে না। অনাবিষ্কৃত জঙ্গলের বর্বর গুহাবাসীরা যদি আধুনিক জাতিগুলোর মানুষের মতো সভ্য হতে চায়, তবে তারা কেবল বক্তৃতা-আলোচনার মাধ্যমে, এমনকি আধুনিক সভ্য জাতিগুলোর রীতিনীতি বর্ণনাকারী সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের মাধ্যমেও এই পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব অর্জন করতে পারবে না। তাদের সভ্য জীবনের মূল্যবোধগুলো জানতে হবে এবং তারপর সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে। শুধু জানলেই তাদের কোন লাভ হবে না। তারা তাদের জ্ঞানের আশীর্বাদ কেবল তখনই দাবি করতে পারবে, যদি তারা যা জানে তা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে প্রস্তুত থাকে। সভ্য মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করার জন্য, তাদের অসভ্য চিন্তা ও কর্মের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, ত্যাগ ছাড়া কোন অগ্রগতিই সম্ভব নয়। মহৎ কর্মের যুবক হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্য আমাদের শৈশবের খেলার রোমাঞ্চ ত্যাগ করতে হবে। আবার, যতক্ষণ না আমরা আমাদের তারুণ্যের চেতনা ত্যাগ করছি, ততক্ষণ আমরা বার্ধক্যের শ্রদ্ধায় পৌঁছাতে পারব না।

যতক্ষণ না আমরা পার্থিব জীবনের হীন পশুসুলভ মূল্যবোধ ত্যাগ করে সেগুলোকে প্রকৃত ধার্মিক জীবনের মহৎ মূল্যবোধ দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে প্রস্তুত হচ্ছি, ততক্ষণ আমরা ধর্মের আশীর্বাদ লাভের আশা করতে পারি না। একটি রান্নার বই যতই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়া হোক না কেন, তা আমাদের ক্ষুধা মেটাতে পারে না। আমরা যতই ওষুধের নাম নিয়ে ধ্যান করি বা জপ করি না কেন, যতক্ষণ না আমরা ওষুধটি গ্রহণ করছি, ততক্ষণ আমাদের প্রয়োজনীয় আরোগ্য লাভ করতে পারি না। একইভাবে, ধর্মের আশীর্বাদ কেবল তখনই আমাদের হতে পারে, যখন আমরা প্রস্তাবিত মূল্যবোধ অনুসারে জীবনযাপন করতে

প্রস্তুত থাকি। অনুশীলিত ধর্মের নিন্দা করা ততটাই অর্থহীন, যতটা অর্থহীন সেই গুহাবাসীরা যারা তাদের খোলা আগুনের চারপাশে বসে উন্নত সভ্যতার বিরুদ্ধে বিরক্তিভরে নিন্দা করত।

উপনিষদ জ্ঞান যজ্ঞের এই একশত দিনব্যাপী সময়ে, আমরা সেই শাশ্বত সুখ ও পরমানন্দ আবিষ্কার করার চেষ্টা করব, যা সকল সত্য ধর্মের সারগর্ভ নির্যাস। উপনিষদে ঘোষিত সত্যের নীতির আলোকে, আমরা আমাদের ধর্মের অংশ বলে বিবেচিত বিভিন্ন অনুশীলনের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করব। এই একশো দিনব্যাপী সম্মিলিত জীবনযাপনের চেতনায় আমরা আবিষ্কার করব পূর্ণতার বিজ্ঞান, যা হিন্দুধর্মের প্রকৃত সারমর্ম।

আসুন আমরা জানি হিন্দুধর্ম কী! আসুন আমরা নিজেদের জন্য, শুধু নিজেদের স্বার্থে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের স্বার্থে একটি আন্তরিক শপথ গ্রহণ করি যে, যখন আমরা শাশ্বত সত্যের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হব, তখন এই প্রাচীন ও পবিত্র ধর্ম দ্বারা প্রচারিত মূল্যবোধগুলোকে যথাসম্ভব সততার সাথে ও সঙ্গতিপূর্ণভাবে যাপন করার চেষ্টা করব।

আসুন আমরা হিন্দু হই, এবং এভাবেই গড়ে তুলি এক সত্যিকারের হিন্দুস্তান (হিন্দুদের আবাস), যা হবে হাজার হাজার শঙ্কর, শত শত বুদ্ধ এবং কয়েক ডজন বিবেকানন্দে পরিপূর্ণ! ওম! ওম! ওম! ■

দক্ষিণবঙ্গের কার্যকর্তা বৈঠক, তাঁতিবেড়িয়া, হাওড়া

মধ্যবঙ্গের কার্যকর্তা বৈঠক, খড়মাডাঙ্গা, রামপুরহাট, বীরভূম

ওঁ

# বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতি বৈঠক

**১৯-২০ জুলাই ২০২৬ ● তেরাপন্থ ভবন, ছতরপুর-নয়াদিল্লি**

**বক্তব্য**

## সন্ত শিরোমণি সদগুরু শ্রী রবিদাসজী-র ৬৫০তম আবির্ভাব বর্ষ (জন্মবার্ষিকী)

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সন্ত শিরোমণি সদগুরু শ্রী রবিদাসজী-র ৬৫০তম আবির্ভাববর্ষের সুবর্ণ সুযোগে তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা আবির্ভাব করছে এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে। ভারতের সন্তদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য ঈশ্বরেরই এক অলৌকিক উপহার। প্রাচীনকাল থেকেই সন্তরা নির্গুণ ও সগুণ ভক্তির ধারা প্রবাহিত করেছেন, সমাজ নিজের রুচি ও সুবিধামতো তাতে অবগাহন করেছে। ভারতবর্ষে সবসময়ই সন্তরা একদিকে সমাজে ছড়িয়ে থাকা বিকৃতি, কুপ্রথা ও ভেদাভেদ দূর করে এক সমরস (একতাবদ্ধ) সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, আর অন্যদিকে বিদেশী আক্রমণকারীদের অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজের লড়াই করার সামর্থ্যকে জাগিয়ে তুলেছেন।

সন্ত রবিদাসজী মহারাজের আবির্ভাব (জন্ম) সেই সময়ে হয়েছিল যখন দিল্লিতে সিকান্দর লোদীর শাসন ছিল। সন্ত রবিদাসজী লোদীর বর্বর ও ক্রুর অত্যাচারের সামনে পাহাড়ের মতো অটল থেকে ঘোষণা করেছিলেন, ‘‘বেদ ধর্ম ত্যাগ করব না, তাতে যদি গলায় তলোয়ারও চলে যায়।’’ তিনি হিন্দু সমাজে ভগবৎ ভক্তির প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। তিনি জগৎগুরু রামানন্দাচার্যের দ্বাদশ (১২) শীর্ষ শিষ্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। অত্যাচারী শাসকরাও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার সামনে মাথা নত করত। তিনি জন্মগত উচ্চ-নিচের ভেদাভেদ অস্বীকার করে কেবল উত্তম আচরণের মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেছিলেন। পরম্পরাগতভাবে চলে আসা কুসংস্কার, কুপ্রথা ত্যাগ করতে এবং যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনকে গ্রহণ করার জন্য সমাজকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহিবে তাঁর ৪১টি বাণী (ভজন) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তাঁর পৈতৃক পেশা চামড়ার জুতো তৈরি করা হলেও, এই সত্য জানার পরও কাশী নরেশ, মেবারের ঝাঁসী রানী, সাধ্বী মীরাবাঈ তাঁকে নিজেদের গুরু হিসেবে বরণ করেছিলেন। তাঁর জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। ‘মন চঙ্গা তো কঠৌতী মে গঙ্গা’ (মন পবিত্র হলে কাঠের পাত্রের জলেও গঙ্গা বিরাজ করে)—এই লোকোক্তি এবং এর পেছনের ঘটনাটি সবার জানা।

যদিও সন্ত রবিদাসজী-র গুরু সগুণোপাসক (সাকার ঈশ্বরের উপাসক) ছিলেন, তবুও সন্ত রবিদাসজী মহারাজ নির্গুণ ভক্তি পরম্পরার বাহক হিসেবে পরিচিত। তিনি ভক্তির পরাকাষ্ঠার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন। তাই তিনি বলতেন, ‘‘প্রভুজি তুম চন্দন হম পানী, জাকী অঙ্গ-অঙ্গ বাস সমানী’’ (হে প্রভু, তুমি চন্দন আর আমি জল, যার সুবাস আমার প্রতিটি অঙ্গে মিশে গেছে)। তিনি সমাজকে সব ভেদাভেদ ভুলে ধর্মের পথে দৃঢ় থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন।

আজ দেশে পুনরায় বিভাজনকারী ও ষড়যন্ত্রমূলক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সমাজকে জাতি ও বর্গে বিভক্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এমন সময়ে সন্ত শিরোমণি শ্রী রবিদাসজী-র জীবন ও আচরণ থেকে প্রেরণা নিয়ে, সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে রাষ্ট্র ধর্মের একতার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করতে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

ওঁ

# বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতি বৈঠক

**১৯-২০ জুলাই ২০২৬ ● তেরাপন্থ ভবন, ছতরপুর-নয়াদিল্লি**

**প্রস্তাব নম্বর-১**

## 'হিন্দু পরিবারকে অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক'

ভারতীয় সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ যে মূল উপাদানগুলো রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হলো হিন্দু পরিবার। সহ-অবস্থান এবং পারস্পরিক আন্তরিকতাই পরিবারের মূল ভিত্তি। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় তাকে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিবেশের অবদান সবচেয়ে বেশি। 'মা প্রথম গুরু, পরিবার পাঠশালা'-এই ধারণা পরিবারেই পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি-সমষ্টি-সৃষ্টি-পরমেষ্ঠীর যাত্রায় 'বসুধৈব কুটুম্বকম' (গোটা বিশ্বই আমার পরিবার)-এর ভাব জাগরণও একটি সুস্থ পারিবারিক পরিবেশেই সম্ভব হয়। সুস্থ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণেই ফলস্বরূপ অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম এবং বিধবা আশ্রমের অস্তিত্ব তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে অতি ভোগবাদী মানসিকতা, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর চিন্তাভাবনা এবং পরিবার পালনের দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতার কারণে পরিবার ব্যবস্থায় কিছুটা ঘাটতি অবশ্যই এসেছে, কিন্তু এর শাশ্বত গুরুত্ব বজায় রয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে পারিবারিক কাঠামোর ওপর হওয়া বিভিন্ন ধরনের আঘাতের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু বিচারকের মাধ্যমে বিবাহ-পূর্ব শারীরিক সম্পর্ক, সমকামী সম্পর্ক, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক এবং লিভ-ইন রিলেশনশিপকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে, যা হিন্দু জীবন-মূল্যবোধ এবং পরিবারের স্বরূপকে নিশ্চিতভাবে আঘাত করে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দু পরিবার ব্যবস্থাকে বামপন্থী ভাবাদর্শ এবং পশ্চিমী জীবনশৈলী দ্বারা প্রভাবিত উপাদানগুলো ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদির আড়ালে সবসময় ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতি দেশের বিচারব্যবস্থার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, পরিবার কাঠামোর সাথে জড়িত সংবেদনশীল বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় এবং মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর কাছেও অনুরোধ জানাচ্ছে যে, তারা যেন পরিবারকে ভেঙে ফেলার মতো আইনগুলো পর্যালোচনা করে সেগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনেন।

টিভি সিরিয়াল, ওয়েব সিরিজ, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং ইন্টারনেটে উপলব্ধ অশ্লীল কনটেন্ট, যা পারিবারিক ভাঙন ও বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ককে উৎসাহিত করে, সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। অনলাইন গেম, যা এক ধরনের ডিজিটাল জুয়া, যার ফাঁদে পড়ে ব্যক্তি ও পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সেই সবকিছুর ওপর অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতির সুচিন্তিত মতামত এই যে, বর্তমানে পরিবারকে সংস্কারসম্পন্ন এবং সুদৃঢ় রাখতে বহুবিধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। একটি আদর্শ পরিবারে প্রবীণদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ, নিজের বংশগত ঐতিহ্যের প্রতি গৌরবানুভূতি, পরিবারের সদস্যদের অনানুষ্ঠানিক ও একসাথে বসা, মন খুলে পারস্পরিক আলোচনা করা, একে অপরকে তার খামতিসহ মেনে নেওয়া, পারস্পরিক আন্তরিকতা, প্রেম তথা অধিকারের স্থানে কর্তব্যের ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়া, যৌথ ভজন-কীর্তন-আরতি ইত্যাদি আদর্শ বজায় রাখা আবশ্যক। যেখানে এই মূল্যবোধের অবহেলা হয়, সেখানে পরিবারের ক্ষতি হয়। কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতি যুবক ও যুবতীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে, বেশি বয়সে বিয়ে করা বা না করা অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, সঠিক বয়সে বিয়ে করুন, পরিবারে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করুন এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের যোগ্য বাহক হন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে দেশের ধর্মীয় জগতের মান্যবরদের প্রতি নিবেদন এই যে, পরিবার ব্যবস্থার গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষা এবং একে আরও বেশি প্রভাবশালী রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা পালন করুন।

কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতির সমগ্র সমাজের প্রতি আহ্বান এই যে, পরিবার কাঠামোকে ভেঙে ফেলার যেকোনো ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ করুন এবং যৌথ পরিবার ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে জীবন-মূল্যবোধকে সযত্নে লালন করে একে শক্তিশালী ও সংস্কারক্ষম করে তোলার দিকে সচেতনভাবে প্রচেষ্টা চালান।

**প্রস্তাবক : শ্রী অম্বরীশ সিংহ জী-দিল্লি** **অনুমোদক : শ্রী লেখরাজ জী রাণা-হিমাচল**

# বন্দে মাতরম্

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলা মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।
কোটি কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
কোটি কোটি ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরম।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাং শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল দল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।।

দেশমাতৃকার চরণে
প্রণাম জানাই


**অধ্যাপক অরুণ চক্রবর্তী**
অনুষদীয় প্রধান (ডিন)
আই.আই.টি, খড়্গপুর

*With Best Compliments From :*

GANPATI LAMINATORS
&
PACKAGERS PVT. LTD.

*Office :*
132, Cotton Street
Kolkata-700007

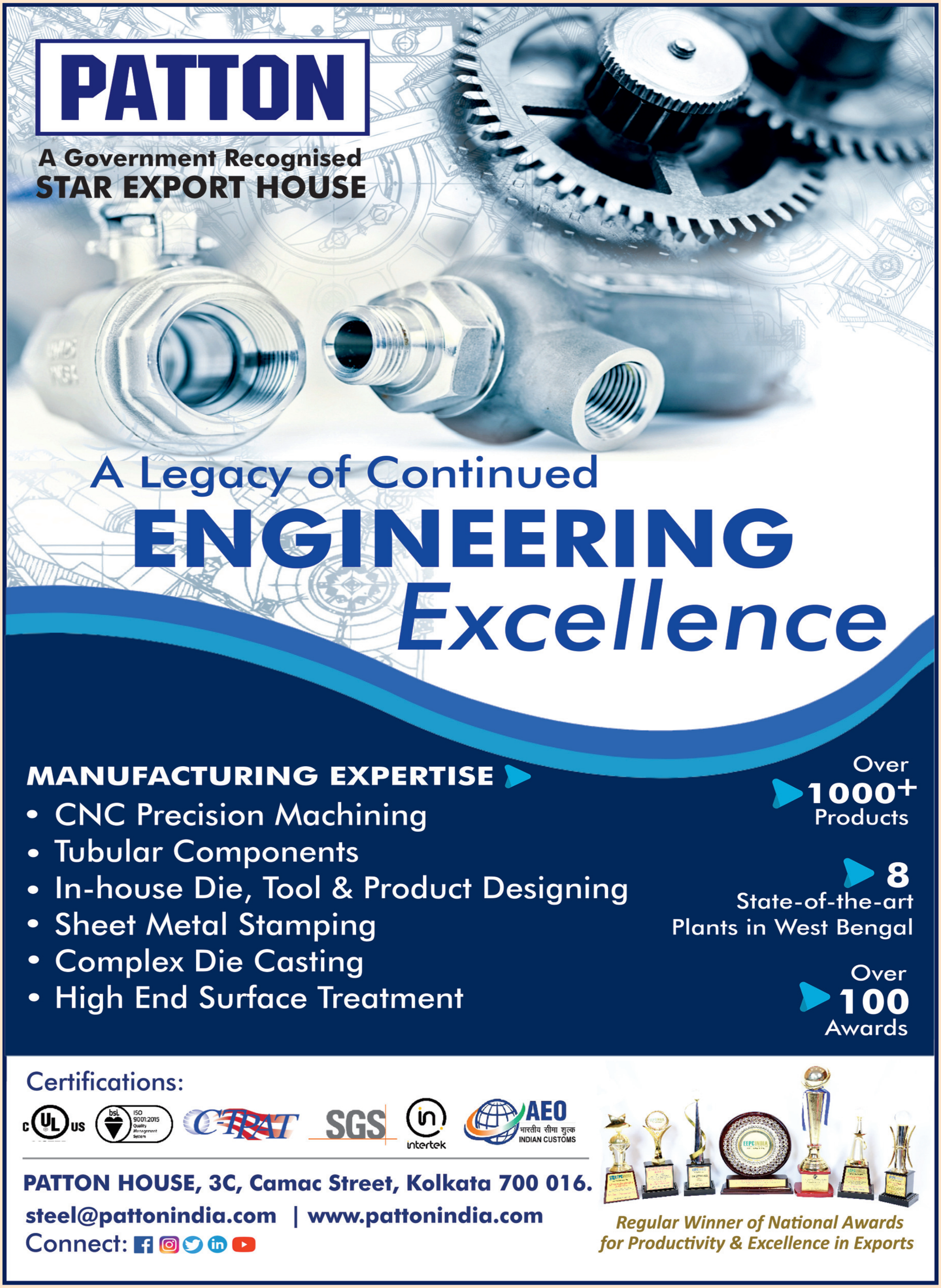
PATTON
A Government Recognised
STAR EXPORT HOUSE
A Legacy of Continued
ENGINEERING
Excellence
MANUFACTURING EXPERTISE
• CNC Precision Machining
• Tubular Components
• In-house Die, Tool & Product Designing
• Sheet Metal Stamping
• Complex Die Casting
• High End Surface Treatment
Over 1000+ Products
8 State-of-the-art Plants in West Bengal
Over 100 Awards
Certifications:
SGS
intertek
AEO
INDIAN CUSTOMS
PATTON HOUSE, 3C, Camac Street, Kolkata 700 016.
steel@pattonindia.com | www.pattonindia.com
Connect:
Regular Winner of National Awards for Productivity & Excellence in Exports

*With Best Compliments From :*

# KALACHAND DAS

**Govt. Contractor**
**&**
**General Order Suppliers**

Vill-Barjumala, P.O.-Khamra
P.S.-Raghunathganj
Dist-Murshidabad, Pin-742213, WB

**Mobile :**
**9733624590 / 7797685527**
**9732315262**

*With Best Compliments From :*

## KAMAL K. KHANDELWAL

(Tea Marketing Consultancy)

## GOLDEN CUP BEVERAGES

# K. GOVIND & CO.

DOMINION BUILDING
7th Floor, Room No. 703
43, Sarat Bose Road
Kolkata-700020

**Mobile : 9830067182**

*With Best Compliments From :*

CHIRANJILAL

# CHIRANJILAL RAYONS PVT. LTD.

**178, Mahatma Gandhi Road, 2nd Floor, Kolkata-700007**
**Mobile : 8420030273, 8420030274**
**E-mail : chiranjilalrayons@gmail.com**
**Website : www.jorahathi.com**

*With best compliments from :*

# SOUTH CALCUTTA DIESELS PVT. LTD.

**225D, A. J. C. Bose Road, Kolkata-700020**
**Phone : 033-2302-5250 / 5253 / 5254 / 5124**
**E-mail : accounts@scdtodi.com / scdtodi@scdtodi.com**

AUTHORISED DEALERS OF

- ***Bosch - Germany (Robert Bosch GMBH)***
- ***Deutz AG, Germany.***
- ***Lombardini S.r.l. - Italy.***
- ***VM Motori S p A - Italy.***
- ***Navantia, S.A. - Spain (Formerly IZAR)***

On the Glorious 52 years
of 'VISHVA HINDU VARTA'
AVINANDAN
Dr. Indranath Banarjee
Dr. B.C. Roy Hospital
IIT KHARAGPUR

SHEMROCK
for a ROCK-Solid Foundation
C.B.S.E BOARD, AFF NO.- 2430434
SHEMFORD
FUTURISTIC SCHOOLS
ADMISSION OPEN
SHEMFORD
FUTURISTIC SCHOOL KATWA
A Genesis of Young Talents.
CBSE Affiliated (K-XII) Senior Secondary Co-Ed School
Affiliation No - 2430434, School Code - 16315
UDISE Code - 19251108101
FROM PLAY GROUP (2+ AGE) TO CLASS XII
FIRST INTERNATIONAL BRANDED CO-ED
ENGLISH MEDIUM SCHOOL IN YOUR AREA
Mob. & Whatsap - 8649818465 (Academics) 8649844075 (Accounts & Others)
Email: shemfordkatwa@gmail.com
CAMPUS AT TIKARKHANJI BUS STAND
(4 K.M. AWAY FROM KATWA BUS STAND ON SH-6)

रघुपति राघव राजाराम।
पतित पावन सीताराम।।

सुंदर विग्रह मेघश्याम।
गंगा तुलसी शालग्राम।।

भद्रगिरीश्वर सीताराम।
भगत–जनप्रिय सीताराम।।

जानकीरमणा सीताराम।
जयजय राघव सीताराम।।

रघुपति राघव राजाराम।
पतित पावन सीताराम।।

रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम।।

# AVINANDAN

on the Glorious 52 years of 'Vishva Hindu Varta'

**Prof. Jaynarayan Kuttippurat**

IIT, Kharagpur

*With best compliments from :*

***Sanjay Kumar Agarwal***
**Mobile : 9830235769**

**kala sangam**
wholesalers of exclusive ethnic wear

**95B, Park Street, 3rd Floor, Kolkata-700016**
**Phone : 033 4008-7265, E-mail : kalasangam95b@gmail.com**

|जय गुरुदेव|

# MILAN BAZAR

**EMBROIDERY & HANDLOOM SAREES**

Dealers: Saree, Salwar Suits, Gown
Kurtis, Sherwani Etc.

88209 72580
74394 21492
87, Jamunalal Bajaj Street, Ground Floor
(Opp. Bilash Rai Katra), Kolkata - 700 007

‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’-র ৫২তম বর্ষে পদার্পণে
অভিনন্দন

Sh Shrabani
শ্রাবণী

A HOUSE OF APPAREL & ACCESSORIES

Contact : 9123042196, 9830971701

102, Ballygunge Gardens, Kolkata-700019

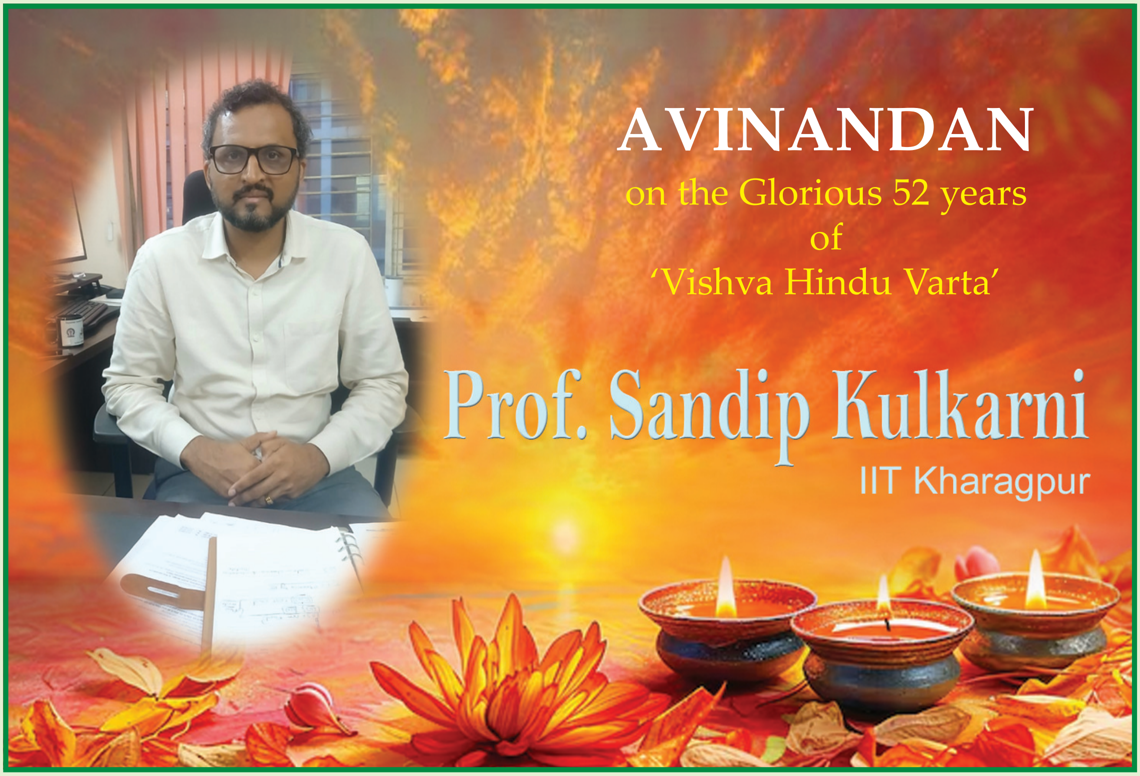


পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাষ্ট্রবাদী নাগরিকদের প্রতি গৈরিক শুভেচ্ছা :

**POULGEN RESEARCH & BREEDING FARMS**
**Breed Name : JAGALMAHAL DESI (CHICKEN)**
**(DESI MURGI)**
**Proprietor : SOURAV KUMAR PATRA**
**Breed Develop by : Dr. Biplab Kumar Patra, M.Vse (Poultry)**

আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বনির্ভর যোজনায় আগামীর সফল উদ্যোগপতি গড়ার লক্ষ্যে উৎসাহী ব্যক্তি কার্যকর্তা কর্মীদের নিঃশুল্ক সহায়তা (প্রশিক্ষণ, ব্যাঙ্কিং) ব্যবস্থা প্রদান করে থাকি।

যোগাযোগ

**POULGEN RESEARCH & BREEDING FARMS**
Vill-Bhetia, P.O.-Salua, P.S.-Kharagpur Local
Dist-Paschim Medinipur, West Bengal-721145
Mobile : +91 9547907336, 7001944198
E-mail : drbkpatra@gmail.com, souravdvet2012@gmail.com

দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে বাংলায় একমাত্র আমরাই
শুধুমাত্র সনাতন হিন্দু ধর্মের বই প্রকাশ করে আসছি

**গিরিজা লাইব্রেরী**
২২/সি কলেজ রো, কলকাতা-৯
✆ ৯৬৭৪৯২১৭৫৮/২২৪১-৫৪৬৮

যোগাচার্য শ্রীমৎ রামানন্দ সরস্বতী সম্পাদিত
সরল বাংলায় চার বেদ একত্রে
**অখণ্ড বেদ-জ্ঞান** ৫০০৲

কালিকানন্দ অবধূত সম্পাদিত
মূল সংস্কৃত ও বাংলা বিশদ অর্থ-ব্যাখ্যা-টীকাসহ
**উপনিষদ সমগ্র** ৬০০৲

পৃথ্বীরাজ সেন প্রণীত
সরল বাংলায় উপনিষদের গল্প-সমূহ একত্রে
**উপনিষদ গল্পসমগ্র** ৪০০৲
**অষ্টাদশ পুরাণ ঃ কাহিনী সমগ্র** ৬০০৲
সরল বাংলা গদ্যে সম্পূর্ণ **শিবপুরাণ** ৮০০৲
সরল বাংলা গদ্যে সম্পূর্ণ **ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ** ৮০০৲

অজয়কুমার ভাণ্ডারী অনূদিত ও সম্পাদিত
সরল বাংলা গদ্যে সম্পূর্ণ **বিষ্ণুপুরাণ** ৪০০৲
সরল বাংলা গদ্যে সম্পূর্ণ **গরুড়পুরাণ** ৫৫০৲
সুললিত গদ্যে সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ সচিত্র **বাল্মীকি রামায়ণ** ৭০০৲
শ্রীচন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
**যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ** ১৬০০৲
ড. অখিল মজুমদার প্রণীত **মহাভারত গল্পসমগ্র** ৭০০৲

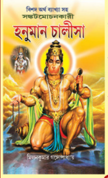


সরল বাংলা গদ্যে **শ্রীমদ্ভাগবত গল্পসমগ্র** ৫০০৲
মিলনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত বিশদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ
**সঙ্কটমোচনকারী হনুমান চালীসা** ২৫০৲
উপাসনা ও পূজাপদ্ধতিসহ
**মহাবীর হনুমান চরিতাবলী** ২০০৲
সরল বাংলা গদ্যে ব্যাখ্যাসহ **রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড** ২৩০৲
স্বামী বেদানন্দ প্রণীত
মূল শ্লোক, পদচ্ছেদ ও সহজ বাংলা অনুবাদ সহ **শ্রীশ্রীচণ্ডী** ৫৫০৲
মূল শ্লোক, পদচ্ছেদ ও সহজ বাংলা গদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ
**গীতা-ভাবনামৃত** ৮০০৲
শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা **চণ্ডী ভাবনামৃত** ২৫০৲
যোগাচার্য্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য প্রণীত যৌগিক ব্যাখ্যাসহ **সুরধূনী গীতা** ৫০০৲
ডঃ শান্তিময় সাধু প্রণীত
বড় হরফে সংস্কৃত, পদ্য, গদ্য গীতা একত্রে **শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা** ২৫০৲

ঘরে বসে বই সংগ্রহ করতে চাইলে অর্ডার দিন
Whatsapp:9830608702 Web.: www.girijalibrary.com
Girija Library f follow করুন। গ্রন্থ-তালিকার জন্য

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য

**শারদ শুভেচ্ছা**

স্ক্যান করুন
বইবন্ধুর সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকা

**বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ**
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৯৯০৭৪১৮৩৪১, ওয়েবসাইট www.boibondhupub.com

**Alpana Ghosal**

BA-81, Sector-1
Salt Lake City
Kolkata-700064

JAI SHREE SHYAM JAI SHREE SHYAM
JAI SHREE SHYAM

*With Best Compliments From :*

# M/s. MPR Bearing & Investment Pvt. Ltd.

Mukti Chamber
5th Floor, Room No. 508
4, Clive Row, Kolkata-700001

*With Best Compliments From :*

**Nimai Shee**
Contact : 9830733880

# ANNAPURNA LASER HOUSE

A HOUSE OF LASER COMPUTER

Laser Type Setting, Stationary
&
General Order Suppliers

13/1, Balai Singha Lane, Kolkata-70009
(Behind Amherst Street City College)

*With Best Compliments From :*

**Deepak Bothra**
**9830284824**

# Maharani Fashions

*A House of Exclusive Lehanga Chunni & Boutique Saree*

95A, Park Street, 2nd Floor, Kolkata-700016
E-mail : maharanifashions@yahoo.com

ওঁ

# বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিচালনা সমিতি বৈঠক

## ১৯-২০ জুলাই ২০২৬ ● তেরাপন্থ ভবন, ছতরপুর-নয়াদিল্লি

**প্রস্তাব নম্বর-২**

## প্রয়াত পূজনীয় স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রতিবেদনের অন্তর্ধান

২০০৮ সালের ২৩শে আগস্ট ওড়িশার কান্ধামাল জেলার জলস্পত আশ্রমে স্বামীজি এবং তাঁর চার শিষ্যের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। 'বেদান্ত কেশরী' নামে পরিচিত স্বামীজি ওড়িশার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সংস্কৃত শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং বালিকা শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবন সনাতন ধর্মের সুরক্ষায় উৎসর্গীকৃত ছিল।

কয়েক দশক ধরে পূজ্য স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী কান্ধামাল-এর প্রত্যন্ত আদিবাসী অঞ্চলে মন্দির নির্মাণ, বালিকা আশ্রম, শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ সহ অসংখ্য কাজ করে গেছেন। তিনি অবৈধ ধর্মান্তরের তীব্র বিরোধিতা করতেন, যা খ্রিস্টান ও মাওবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তারা মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে বারবার তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। অবশেষে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সহিংস পরিবেশে বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। খ্রিস্টান মাওবাদী ষড়যন্ত্রকারীরা এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে এবং আদালত সাতজন খ্রিস্টানকে দোষী সাব্যস্ত করে। অনেক প্রশ্নই অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

ওড়িশা সরকার কান্ধামালের ২০০৭-০৮ সালের সহিংসতা এবং স্বামীজির হত্যাকাণ্ড তদন্তের জন্য বেশ কয়েকটি বিচার বিভাগীয় কমিশন নিয়োগ করেছিল। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরের সহিংসতা তদন্তের জন্য বিচারপতি বাসুদেব পনিগ্রাহী কমিশন গঠন করা হয়েছিল, যেটি ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে তার প্রতিবেদন জমা দেয়।

পরবর্তীকালে, ২০০৮ সালের ২৩শে আগস্টের হত্যাকাণ্ড এবং তার পরবর্তী ব্যাপক সহিংসতার একটি বিশদ তদন্ত পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে বিচারপতি শরৎচন্দ্র মহাপাত্র কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ২০১২ সালে বিচারপতি মহাপাত্রের মৃত্যুর পর, বিচারপতি এ.এস. নাইডুকে এই একক সদস্যের কমিশনের চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করা হয়। নাইডু কমিশন একটি বিশদ তদন্ত পরিচালনা করে এবং প্রায় ১,৫০০ থেকে ২,০০০ পৃষ্ঠার একটি দুই খণ্ডের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে, যা ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবেদনে হত্যাকাণ্ডের প্রধান কারণ হিসেবে ধর্মান্তরের প্রতিশোধকে উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে কান্ধামালের সামাজিক পরিস্থিতি, সহিংসতার কারণ, মাওবাদীদের ভূমিকা, প্রশাসনিক ত্রুটি এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার পরামর্শও খতিয়ে দেখা হয়েছিল। প্রতিবেদনটি কখনও জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। ২০২৬ সালের জুন মাসে জানা যায় যে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রতিবেদনটি উধাও হয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর একটি এফ.আই.আর দায়ের করে। পূজ্য স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী স্মৃতিন্যাসেই মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির সঙ্গে দেখা করে প্রতিবেদনটি উদ্ধার এবং একটি স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানায়।

প্রতিবেদনটির অন্তর্ধান সত্যকে দমনের একটি ষড়যন্ত্র বলে মনে হচ্ছে। এটি বিচারিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে, হিন্দু সাধুদের প্রতি নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়াচ্ছে এবং ধর্মান্তরের সাথে জড়িত শক্তিগুলোকে উৎসাহিত করছে। এই ঘটনাটি সরকার ও আইনশৃঙ্খলার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত হানে।

**কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে যে :**

১. গায়েব হওয়ার ঘটনাটির সিবিআই তদন্ত করা উচিত, যাতে সকল ষড়যন্ত্রকারীর চেহারা উন্মোচিত হয়।

২. অবৈধ ধর্মান্তর প্রতিরোধকারী আইনগুলো পর্যালোচনা করে আরও কঠোর ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন; আদিবাসী এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাড়ানো উচিত।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি ২০২৬ সালের জন্মশতবার্ষিকীতে স্বামীজির পবিত্র স্মরণে বিভিন্ন কর্মসূচি, স্মৃতিসৌধ নির্মাণ ও আদিবাসী কল্যাণমূলক প্রকল্প শুরু করার জন্য এবং অবৈধ ধর্মান্তর সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার শপথ গ্রহণের জন্য সমাজের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

**প্রস্তাবক : শ্রী বিজয়শঙ্কর তিওয়ারি, গাজিয়াবাদ** **অনুমোদনকারী : শ্রী অমিয় সরকার, কলকাতা**

# रामराज्य की पुनर्प्रतिष्ठा

## आस्था, उत्तरदायित्व और व्यवस्था का सनातन प्रतिमान

**प्रशांत सिंघानिया**

''रामो विग्रहवान् धर्मः।''—वाल्मीकि रामायण

**जब मंदिर केवल मंदिर नहीं रहता**

अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण केवल एक भव्य स्थापत्य की पूर्णता नहीं है। यह भारत की सहस्राब्दियों पुरानी सभ्यतागत चेतना, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और एक दीर्घ सांस्कृतिक संकल्प की मूर्त अभिव्यक्ति है। किन्तु किसी भी महान सभ्यता की पहचान केवल उसके स्मारकों से नहीं होती। उसकी वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि वह अपने मूल्यों को अपनी संस्थाओं, व्यवस्थाओं और आचरण में कितना उतार पाती है।

इतिहास में अनेक साम्राज्य अपनी शक्ति, वैभव और स्थापत्य के कारण प्रसिद्ध हुए, किन्तु समय के प्रवाह में विलीन हो गए। इसके विपरीत कुछ सभ्यताएँ सहस्राब्दियों बाद भी जीवित रहती हैं, क्योंकि उनका आधार केवल शक्ति नहीं, बल्कि संस्कृति होती हैं; केवल अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व होता है; केवल व्यवस्था नहीं, बल्कि मर्यादा होती है। भारत ऐसी ही एक सभ्यता है। भारतीय जीवन में मंदिर कभी केवल पूजा का स्थान नहीं रहा। वह समाज की सामूहिक चेतना, सांस्कृतिक स्मृति और आध्यात्मिक जीवन का केन्द्र रहा है। भक्त मंदिर में केवल पुष्प, जल, स्वर्ण अथवा धन अर्पित नहीं करता; वह अपनी श्रद्धा, अपने परिवार का मंगल, अपनी परम्परा और अपने जीवन का समर्पण अर्पित करता है।

इसीलिए भारतीय परम्परा में मंदिर का वास्तविक वैभव उसके शिखर की ऊँचाई से नहीं, बल्कि उसके प्रति समाज के श्रद्धाजन्य भरोसे से मापा जाता है। किसी मंदिर की सबसे बड़ी सम्पत्ति उसकी तिजोरी में सुरक्षित धन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था होती है। धन की पूर्ति समय के साथ सम्भव है, किन्तु लोक आस्था और संस्थागत विश्वसनीयता की क्षति की पूर्ति अत्यन्त कठिन होती है। यहीं भारतीय सभ्यता संसार के समक्ष अपनी एक अद्वितीय अवधारणा प्रस्तुत करती है—न्यास।

न्यास का अर्थ केवल किसी सम्पत्ति की देखरेख करना नहीं है। यह वह सभ्यतागत दृष्टि है जिसमें मनुष्य स्वयं को स्वामी नहीं, बल्कि संरक्षक मानता है। जो कुछ उसे प्राप्त है—धन, पद, अधिकार, प्रतिष्ठा अथवा शक्ति—वह केवल निजी उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज और ईश्वर द्वारा सौंपा गया दायित्व है। इसी दृष्टि से अयोध्या में श्रीराम केवल एक स्थापत्य उपलब्धि नहीं है; वह भारत के लिए एक ऐसा अवसर भी है जहाँ प्राचीन न्यास-परम्परा आधुनिक उत्तरदायित्व और संस्थागत मर्यादा के साथ पुनः प्रतिष्ठित हो सकती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि मंदिर कितना भव्य है। प्रश्न यह है—क्या उससे जुड़ी व्यवस्था भी उसी मर्यादा का प्रतिबिम्ब होगी, जिसके प्रतीक स्वयं श्रीराम हैं?

**भारत : स्वामित्व की नहीं, न्यास-सभ्यता की भूमि**

*''ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।*
*तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।''*
*—ईशावास्योपनिषद्*

विश्व की अनेक सभ्यताओं ने सम्पत्ति का आधार स्वामित्व को माना। भारतीय मनीषा ने प्रश्न को ही बदल दिया। यहाँ मूल प्रश्न यह नहीं है—''स्वामी कौन है?'' बल्कि—''न्यासी कौन है?'' यदि सम्पूर्ण जगत ईश्वरमय

है, तो मनुष्य किसी वस्तु का निरपेक्ष स्वामी कैसे हो सकता है? उसे जो कुछ प्राप्त है—धन हो, पद हो, अधिकार हो अथवा शक्ति—वह एक उत्तरदायित्व है, जिसका उपयोग धर्मपूर्वक लोकमंगल के लिए किया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीय परम्परा में राजा भी संरक्षक है, गृहस्थ भी संरक्षक है और धार्मिक न्यास का संचालक भी समाज द्वारा सौंपे गए दायित्व का धारक है।

भारत को यदि एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है—भारत स्वामित्व की नहीं, न्यास-सभ्यता की भूमि है। यहाँ सम्पत्ति का सर्वोच्च उद्देश्य उपभोग नहीं, लोकमंगल है; अधिकार का सर्वोच्च उद्देश्य प्रतिष्ठा नहीं, सेवा है; और पद का सर्वोच्च अर्थ शक्ति नहीं, उत्तरदायित्व है।

### रामराज्य : मर्यादा का संस्थागत आदर्श

*''दैहिक दैविक भौतिक तापा।*
*राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।।''*

*—श्रीरामचरितमानस*

रामराज्य को सामान्यतः आदर्श शासन के रूप में स्मरण किया जाता है। किन्तु रामराज्य केवल प्रशासनिक दक्षता का नाम नहीं है; वह शासन की आत्मा है। उसका अर्थ यह नहीं कि समाज में कभी कोई चुनौती, संघर्ष अथवा मानवीय दुर्बलता उत्पन्न नहीं होगी। इतिहास में ऐसा पूर्ण समाज कभी अस्तित्व में नहीं रहा। रामराज्य का वास्तविक अर्थ है—ऐसी व्यवस्था जिसमें न्याय व्यक्ति की इच्छा पर नहीं, बल्कि मर्यादा और सिद्धान्तों पर आधारित हो; जहाँ पद व्यक्ति से बड़ा न हो, बल्कि सिद्धान्त पद से भी बड़े हों; और जहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति निजी अधिकार नहीं, बल्कि लोकहित और उत्तरदायित्व का विषय मानी जाए।

श्रीराम भारतीय मानस में केवल आराध्य नहीं है; वे उस मर्यादा के प्रतीक हैं जिसमें शक्ति और धर्म, अधिकार और कर्तव्य शासन और सेवा एकाकार हो जाते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ किसी संकीर्ण पहचान से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जो समाज के न्याय, संतुलन और नैतिक आधार की रक्षा करे। रामराज्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल राजकीय सामर्थ्य नहीं थी; उसकी वास्तविक शक्ति थी—प्रजा का भरोसा। यही कारण है कि श्रीराम का शासन केवल सत्ता का नहीं, मर्यादा और उत्तरदायित्व का आदर्श माना गया। इसीलिए रामराज्य किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं, बल्कि ऐसी मर्यादा का नाम है जो व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज की स्थायी धरोहर बन जाती है।

### भरत : सत्ता नहीं, सेवा का आदर्श

यदि रामराज्य उसकी शासन-व्यवस्था का आदर्श है, तो न्यासधर्म उसकी आत्मा है। श्रीराम के जीवन में न्यासधर्म का सर्वोच्च उदाहरण भरत हैं। अयोध्या का सिंहासन उनके सामने था। राजकीय अधिकार उनके हाथ में आ सकता था। परिस्थितियाँ भी उनके पक्ष में थीं। किन्तु भरत ने सत्ता को अपना अधिकार नहीं माना। उन्होंने श्रीराम की चरणपादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं को केवल राज्य का संरक्षक स्वीकार किया। यह प्रसंग केवल भ्रातृप्रेम का उदाहरण नहीं है; यह भारतीय राज्य-दर्शन की गहन घोषणा है—सत्ता स्वामित्व नहीं, न्यास है।

राजा राज्य का मालिक नहीं, लोक का सेवक है। भरत ने यह सिद्ध किया कि वास्तविक नेतृत्व वह नहीं जो अधिकार प्राप्त करे, बल्कि वह है जो अधिकार को उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करे। भारतीय राज्यदर्शन का यही मूल सिद्धान्त है—स्वामित्व नहीं, न्यासधर्म। इसी कारण किसी भी व्यवस्था की स्थिरता केवल श्रेष्ठ व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि उत्तरदायी व्यक्तित्व और मर्यादित व्यवस्था-दोनों के संतुलन पर निर्भर करती है। रामराज्य का आदर्श इसी संतुलन में निहित है—उत्तरदायी व्यक्ति और मर्यादित व्यवस्था।

### कौटिल्य : आदर्श और यथार्थ का संतुलन

भारतीय परम्परा ने न्यासधर्म को केवल आध्यात्मिक आदर्शों तक सीमित नहीं रखा। उसने प्रशासनिक यथार्थ को भी उतनी ही गंभीरता से समझा। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सार्वजनिक धन, राजकोष और प्रशासनिक उत्तरदायित्व की सुरक्षा के लिए अत्यन्त व्यावहारिक सिद्धान्त प्रस्तुत किए। वे लिखते हैं—

''यथा ह्युदके चरन्तो मत्स्या जलं पिबन्ति न दृश्यन्ते,
एवं कार्येषु नियुक्ताः पुरुषा अर्थमाददाना न दृश्यन्ते।''

अर्थात् जैसे जल में रहने वाली मछली कब जल पी जाती है, यह जानना कठिन होता है, उसी प्रकार सार्वजनिक

कार्यों में नियुक्त व्यक्ति कब अनुचित लाभ उठा लें, यह समझना सरल नहीं होता। यह कथन मनुष्य के प्रति अविश्वास नहीं, बल्कि प्रशासनिक यथार्थवाद का परिचायक है। कौटिल्य समझते थे कि केवल सदाचार की अपेक्षा पर्याप्त नहीं होती। इसलिए उन्होंने लेखा-परीक्षण, निरीक्षण, उत्तरदायित्व और दण्ड व्यवस्था जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं पर विशेष बल दिया।

यहीं भारतीय दृष्टि का अद्वितीय संतुलन दिखाई देता है। धर्म व्यवस्था का विकल्प नहीं है; वह व्यवस्था की आत्मा है। और व्यवस्था धर्म की संरक्षक है। इसलिए रामराज्य में केवल शासक का धर्मनिष्ठ होना पर्याप्त नहीं, बल्कि, पूरी व्यवस्था का पारदर्शी, उत्तरदायी और मर्यादित होना भी उतना ही आवश्यक है।

### देवद्रव्य : केवल सम्पत्ति नहीं, श्रद्धा का मूर्त रूप

यही सिद्धान्त मंदिरों पर भी समान रूप से लागू होता है। मंदिर में अर्पित धन, स्वर्ण, रजत अथवा अन्य सामग्री केवल आर्थिक सम्पत्ति नहीं होती; वह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का मूर्त रूप होती है।

किसी निर्धन किसान द्वारा अर्पित कुछ रुपये, किसी वृद्धा द्वारा दिया गया छोटा-सा आभूषण, किसी उद्योगपति का बड़ा योगदान अथवा किसी बालक की गुल्लक—इन सबका आध्यात्मिक मूल्य समान है, क्योंकि इनका आधार श्रद्धा है। इसलिए देवद्रव्य की रक्षा केवल वित्तीय प्रबन्धन का विषय नहीं; यह धर्मरक्षण, लोकआस्था और न्यासधर्म का विषय है।

### उत्तरदायित्व की कसौटी : घटना से सुधार तक

हाल के समय में मंदिर की दानराशि से संबंधित चोरी की घटनाएँ सामने आई। संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुई, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और विधिसम्मत जाँच प्रारम्भ की गई। यह स्पष्ट संदेश था कि देवद्रव्य के साथ किसी प्रकार की आपराधिक छेड़छाड़ अस्वीकार्य है और उसके प्रति शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। किसी भी उत्तरदायी न्यास की परिपक्वता इस बात से नहीं मापी जाती कि वहाँ कभी कोई चुनौती उत्पन्न नहीं हुई। वास्तविक कसौटी यह है कि चुनौती सामने आने पर उसका उत्तर क्या था। इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि इस घटना को व्यवस्थाओं की समीक्षा और उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने के अवसर के रूप में स्वीकार किया गया। यही न्यासधर्म की भावना है—त्रुटि को छिपाना नहीं, उससे सीखकर व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाना। किसी भी उत्तरदायी संस्था की वास्तविक शक्ति इसी आत्मसुधार की क्षमता में निहित होती है।

### तथ्य, आरोप और सार्वजनिक विमर्श

इसी अवधि में मंदिर में अर्पित बहुमूल्य वस्तुओं और आभूषणों के संबंध में अनेक आरोप भी सार्वजनिक विमर्श का विषय बने। बाद में संबंधित वस्तुओं का सार्वजनिक सत्यापन किया गया तथा उन्हें समाज और मीडिया के समक्ष प्रदर्शित किया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि आरोप और प्रमाण एक ही बात नहीं होते। लोकतांत्रिक समाज में प्रश्न पूछना आवश्यक है, किन्तु, निष्कर्ष सदैव प्रमाण, तथ्य और विधिसम्मत प्रक्रिया पर आधारित होने चाहिए, न कि प्रचार अथवा आशंकाओं पर।

श्रीराम जन्मभूमि का विषय केवल एक धार्मिक संस्थान का विषय नहीं है; वह करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा विषय है। इसलिए उससे संबंधित प्रत्येक घटना पर समाज का ध्यान जाना स्वाभाविक है। किन्तु यह भी उतना ही स्पष्ट है कि कुछ राजनीतिक और वैचारिक समूहों ने इस सीमित आपराधिक घटना को केवल अपराध के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे सम्पूर्ण श्रीराम मंदिर, उसके न्यास और यहाँ तक कि सनातन धर्म की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाने के अवसर के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह दृष्टिकोण न तो न्यासंगत है और न ही बौद्धिक ईमानदारी के अनुरूप।

वर्षों तक श्रीराम मंदिर आन्दोलन का विरोध करने वाले, भगवान श्रीराम के ऐतिहासिक अस्तित्व तक पर प्रश्न उठाने वाले तथा मंदिर निर्माण का प्रतिरोध करने वाले अनेक स्वर इस अवसर पर अचानक मंदिर-व्यवस्था के सबसे बड़े हितैषी के रूप में सामने आए। किसी भी लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार निर्विवाद है; किन्तु जब आलोचना का उद्देश्य सुधार न होकर किसी सभ्यता, उसकी आस्था और उसकी सांस्कृतिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना बन जाए, तब समाज के लिए उस प्रवृत्ति को पहचानना भी आवश्यक हो जाता है।

एक अपराधी का अपराध सम्पूर्ण संस्था का अपराध नहीं बन जाता। और किसी संस्था में उत्पन्न चुनौती सम्पूर्ण परम्परा का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकती। न्याय का तकाज़ा है कि उत्तरदायित्व दोषी व्यक्तियों का निर्धारित हो, न कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का।

### न्याय का धर्म : तथ्य और प्रमाण

यदि किसी स्तर पर देवद्रव्य से संबंधित अपराध सिद्ध होता है, तो वह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि श्रद्धा से जुड़े दायित्व का उल्लंघन है। इसलिए निष्पक्ष जाँच, विधिसम्मत कारवाई और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उतना ही आवश्यक यह भी है कि आरोपों को प्रमाण का स्थान न दिया जाए।

धर्म केवल आस्था की रक्षा नहीं करता; वह सत्य की भी रक्षा करता है। इसलिए इस पूरे प्रसंग से जो सबसे बड़ा सिद्धान्त उभरकर सामने आता है, वह यही है—न अपराध को छोटा किया जा सकता है, न आरोप को प्रमाण से बड़ा बनाया जा सकता है। यह रामराज्य की मर्यादा है। यही न्याय का धर्म है।

### व्यक्ति नहीं, व्यवस्था सर्वोपरि

भारतीय परम्परा व्यक्ति-प्रधान नहीं, सिद्धान्त-प्रधान है। किसी भी व्यवस्था की स्थिरता व्यक्तियों की महानता पर नहीं, बल्कि उन मूल्यों और मर्यादाओं पर निर्भर करती है जिनके अनुसार वह संचालित होती है। यही कारण है कि रामराज्य में व्यक्ति से अधिक महत्व धर्मसम्मत व्यवस्था का है।

### अयोध्या : एक अनुकरणीय न्यास-प्रबंधन की दिशा में

आज अयोध्या केवल एक तीर्थ नहीं है; वह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। इसलिए उसके साथ जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था भी उसी मर्यादा की अधिकारी है जिसकी प्रेरणा स्वयं श्रीराम से मिलती है। अयोध्या का महत्व केवल एक भव्य मंदिर तक सीमित नहीं है। यह अवसर धार्मिक न्यासों के सुशासन, उत्तरदायित्व और मर्यादित प्रबंधन की भारतीय परम्परा को और अधिक सुदृढ़ रूप में प्रतिष्ठित करने का है। यह आधुनिकता और परम्परा के संघर्ष का नहीं, बल्कि उनके समन्वय का विषय है। श्रद्धा और सुशासन परस्पर विरोधी नहीं हैं; वे एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

### आधुनिक साधन, सनातन मर्यादा : पारदर्शी न्यास-प्रबंधन की दिशा

आज के युग में न्यासधर्म की रक्षा केवल सद्भावना से नहीं, बल्कि सुदृढ़ व्यवस्थाओं और आधुनिक तकनीकी साधनों से भी होती है। जिस प्रकार कौटिल्य ने अपने समय में लेखा-परीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण व्यवस्था पर बल दिया था, उसी प्रकार वर्तमान युग में तकनीक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। मंदिरों और धार्मिक न्यासों के लिए डिजिटल लेखा प्रणाली, नियमित स्वतंत्र ऑडिट, दान की पारदर्शी निगरानी, सम्पत्तियों का डिजिटल अभिलेखीकरण, बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रणाली, सीसीटीवी आधारित सुरक्षा, इन्वेंटरी प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएँ संस्थागत विश्वास को और सुदृढ़ कर सकती हैं।

तकनीक का उद्देश्य केवल नियंत्रण स्थापित करना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा करना है। जब आधुनिक प्रबंधन प्रणालियाँ भारतीय न्यास-परम्परा के मूल्यों के साथ जुड़ती हैं, तब श्रद्धा और सुशासन एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं। आदर्श व्यवस्था वह नहीं जिसमें केवल अच्छे लोग हों, बल्कि वह है जहाँ अच्छी व्यवस्था अच्छे और कठिन दोनों समय में मर्यादा की रक्षा कर सके।

### सेवा : रामराज्य का अनिवार्य आयाम

भारतीय परम्परा में मंदिर केवल पूजा के केन्द्र नहीं रहे। वे शिक्षा, सेवा, अन्नदान, संस्कार, संस्कृति और सामाजिक समरसता के भी केन्द्र रहे हैं। इसलिए किसी मंदिर की श्रेष्ठता केवल उसकी व्यवस्था से नहीं, बल्कि उसके लोकमंगल से भी मापी जाती है। जब व्यवस्था और सेवा एक-दूसरे की पूरक बनती हैं, तभी रामराज्य का आदर्श जीवन्त होता है।

### मंदिरों की स्वायत्तता और उत्तरदायी न्यासधर्म

अयोध्या का प्रसंग एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श को भी सामने लाता है—हिन्दू मंदिरों की स्वायत्तता का प्रश्न। यह केवल अधिकार का विषय नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व का भी विषय है। स्वायत्तता तभी स्थायी सम्मान प्राप्त करती है जब उसके साथ अनुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जुड़े हों। अधिकार और दायित्व एक-दूसरे के पूरक हैं;

किसी एक के अभाव में दूसरा भी दूर्बल हो जाता है। भारतीय न्यास-परम्परा की यही विशेषता है कि वह स्वायत्तता को उत्तरदायित्व से अलग नहीं करती।

**रामराज्य की पुनर्प्रतिष्ठा : एक मंदिर से आगे, एक सभ्यता की यात्रा**

*''परहित सरिस धरम नहि भाई।*
*पर पीड़ा सम नहि अधमाई।।''*

*—श्रीरामचरितमानस*

किसी भी महान सभ्यता की पहचान केवस उसके स्मारकों की भव्यता से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह अपने मूल्यों को अपनी संस्थाओं और आचरण में कितना उतार पाती है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण भारत के सांस्कृतिक इतिहास की एक युगांतकारी उपलब्धि है। यह करोड़ों लोगों की श्रद्धा, धैर्य और संकल्प का प्रतीक है। किन्तु मंदिर निर्माण यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा का प्रारम्भ है—उस मर्यादा के अनुरूप व्यवस्था निर्माण की, जिसका प्रतीक स्वयं श्रीराम हैं।

भव्य मंदिर के साथ भव्य व्यवस्था। आस्था के साथ उत्तरदायित्व। श्रद्धा के साथ पारदर्शिता। और शक्ति के साथ सेवा। यही रामराज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का पथ है। इस पूरे प्रसंग ने एक बार पुनः स्मरण कराया कि धर्म भावनाओं की रक्षा करता है, परन्तु सत्य की रक्षा भी उतनी ही करना है। इसलिए न अपराध को छोटा किया जा सकता है और न आरोप को प्रमाण से बड़ा बनाया जा सकता है।

मंदिर पत्थरों से बनते हैं; उनकी मर्यादा उन मूल्यों से निर्मित होती है जिन्हें उनकी व्यवस्थाएँ प्रतिदिन जीती हैं। रामराज्य की वास्तविक पुनर्प्रतिष्ठा केवल भव्य मंदिर के निर्माण से नहीं होगी। वह तब होगी जब न्यासधर्म, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और लोकसेवा श्रीराम की मर्यादा के अनुरूप मंदिर की प्रत्येक व्यवस्था का स्वाभाविक संस्कार बन जाएँ। तभी अयोध्या का श्रीराम मंदिर केवल भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं रहेगा, बल्कि रामराज्य की सनातन मर्यादा, न्यासधर्म और भारत की सभ्यतागत चेतना का जीवंत प्रतिमान बन जाएगा।'' ■ ।। **श्रीरामाय नमः** ।।

জেলা কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ, নদীয়া, মধ্যবঙ্গ

প্রান্ত কার্যকর্তা শিক্ষা বর্গ, খড়মাডাঙ্গা, রামপুরহাট, মধ্যবঙ্গ

*With best compliments from :*

**SANTOSH SINGH CHOUHAN**

**29, M. G. ROAD, ARIADAHA, KAMARHATI**
**KOLKATA-700057**

**MOBILE : 9143114694**

# मन्दिर का आध्यात्म एवं राजनीतिक आधार

अरुण चूड़ीवाल

मुंडकोपनिषद का एक श्लोक है—द्वा सुपर्ण सजुया सखाया।

मंत्रदृष्टा ऋषि अंतःदृष्टि से एक ही वृक्ष पर अवस्थित दो गहन मित्रों को देख सकते थे। जहां पहले पक्षी फलों का आस्वादन कर रहा है और दूसरा पक्षी दृष्टा बन तटस्थ है।

मंत्रदृष्टा ऋषियों की यह दृष्टि जनसाधारण के लिए संभव नहीं है अतः जीवरूपी यह दूसरा पक्षी अपने उस परम मित्र को संसार में खोजता है एवं उसे तटस्थ भाव से स्थित साकार मूर्ति रूप में मन्दिर में प्राप्त करता है। अतः ऋषियों की निराकार रूप में अंर्तदृष्टि सामान्यजन की दृष्टि में साकार रूप में मंदिर है।

कतिपय विद्वानों के अनुसार मन्दिर का मद् धातु से इर् प्रत्यय जोड़ने से बनता है—अर्थात् जहां निवास किया जाए पर अमरकोश के अनुसार मंदिर स्वयं में पूर्ण धातु है।

श्रीमद्भागवत पुराण के एकादश स्कंध के 27वें अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण उद्धव जी को क्रियायोग का वर्णन करते हुए 28 वें श्लोक में कहते हैं :

शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती।

मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता।। 12

अर्थात् मेरी मूर्ति आट प्रकार की होती है—1. पत्थर, 2. लकड़ी, 3. धातु, 4. मिट्टी, 5. चंदन, 6. चित्रमयी, 7. बालुकायी, 8. मनोमयी।

इस प्रकार मन्दिर अस्थायी बालुकामयी मूर्ति से लेकर शताब्दियों तक स्थित रहने वाला पाषाण के होते हैं। मन्दिर में भगवान की प्रतिमा भी भावना अनुकूल पंचदेव अथवा अन्य किसी इष्ट की होती है।

प्रतिमा के साथ भावनाओं का महत्व इंगित करते हुए श्री अरविंद (कल्याण के 15 वर्ष के विशेषांक के अनुसार) कहते हैं—

''मनुष्य के लिये अपने अंदर अवस्थित किसी अदृश्य सत्ता पर विश्वास करना तो कठिन होता है, पर किसी ऐसी वस्तुपर विश्वास करना कठिन नहीं होता जो उसके अंदर नहीं बल्कि बाहर है, उससे भिन्न है। इसीलिये बहुत से मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाह्य आश्रय, श्रद्धा का कोई बाह्य विषय आवश्यक हो जाता है।

भगवान् मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार अपने आपको देवता, अवतार या सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट करते हैं—अवश्य ही इस रूप में मार्ग दर्शक का काम करते हुए वे एक ऐसे घने आवरण का उपयोग करते हैं कि जिससे उनका ईश्वरत्व छिपा रहता है।

मानव जीव की इस प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिये हिंदुओं की आध्यात्मिक साधना में इष्टदेवता, अवतार की व्यवस्था है। इष्टदेवता से अभिप्राय है भगवान् के उस विशिष्ट नाम-रूप का, जिसे हमने वरण किया हो; यह किसी निम्नस्तर की कोई कनिष्ठ शक्ति नहीं, प्रत्युत उस नाम-रूप से स्वयं भगवान् ही हैं।

भगवान् समग्र हैं, समग्र से भी अधिक हैं। पर मनुष्य उसकी धारणा कैसे कर सकता है, जो समग्र से भी अतीत है? केवल समग्र की धारणा करना भी आरम्भ में उसके लिये अत्यन्त कठिन है; क्योंकि वह स्वयं अपनी प्राकृत चेतना के अंदर एक परिसीमित और पृथकृत पदार्थ है और इसलिये वह ऐसी ही सत्ता की और उन्मुख हो सकता है, जिसका उसकी इस परिसीमित प्रकृति के साथ मेल हो। समग्र में तो ऐसी-ऐसी चीजें हैं, जिनकी धारणा उसके लिये अत्यन्त कठिन है अथवा जो उसके कोमल हृदय और दुर्बल इन्द्रियों को बहुत ही भयानक प्रतीत हो सकती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि वह अपनी ही आकृति के अनुरूप भगवान् की कल्पना करे अथवा भगवान् के किसी ऐसे रूप की भावना करे, जो उसकी आकृति के परे पर उसकी उच्च प्रवृत्तियों के अनुकूल और उसके हृदय और बुद्धि के लिये ग्राह्य हो।''

अंतःकरण की इन्हीं भावनाओं का साक्षात् स्वरूप भक्त मन्दिर में साकार रूप में प्राप्त करता है।

इन्हीं मानवीय भावनाओं का साकार स्वरूप परिवार के रूप में शिव मन्दिर में पार्वती जी, कार्तिकेय जी एवं

गणेश जी के साथ होता है। परिवार का यही स्वरूप जगन्नाथपुरी में भगवान श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ परिलक्षित होते हैं। भेंट द्वारका में सुदामा के साथ श्रीकृष्ण परिवार का अभिन्न अंग मित्र रूप में प्रकट होते हैं। गृहस्थ आश्रम का आदर्श दंपति स्वरूप लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम के अनेक मन्दिर हैं। मधुर भाव में भगवान श्रीकृष्ण परम आराध्य राधाजी के साथ विराजते हैं। परिवार का बालक भाव प्रत्येक सनातनीय के घर में बालकृष्ण लड्डु गोपाल रूप में अवस्थित हैं। भक्त की भावना के अनुसार भगवान साकार रूप में मन्दिर में स्थापित होते हैं।

भक्त की साधना जब चरम अवस्था पर पहुंच जाता है तब मन्दिर की पाषाण मूर्ति भी सजीव हो उठती है। मीराबाई का द्वारकाधीश विग्रह में प्रवेश तथा रामकृष्ण परमहंस का मां काली से वार्तालाप आधुनिक काल के सजीव दृष्टांत हैं।

सामान्यतः मन्दिर राजाओं द्वारा अथवा श्रेष्ठीगण द्वारा निर्मित किए जाते हैं अर्थात् पुरुषार्थ चतुष्टय के अर्थ का मन्दिर से गहन संबंध है। पुरुषार्थ चतुष्टय का लक्ष्य है धर्म आधारित अर्थ एवं काम के सेवन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। इसी हेतु मन्दिरों का निर्माण किया जाता है। मन्दिर निर्माण में अर्थ नितांत आवश्यक है।

इसी प्रकार मन्दिरों में धर्म आधारित काम को भी महत्व दिया जाता है। भारतीय मन्दिरों की वाह्य मूर्ति कला में नृत्य और संगीत की मूर्तियां आवश्यक है। इसी प्रकार काम रत दंपति सिर्फ खजुराहो जगन्नाथ पुरी में ही नहीं वरन् पद्मनाभन मन्दिर में दृष्टिगोचर होते हैं।

भारत के प्राचीन मन्दिर अर्थात् 800-1000 वर्ष पूर्व के अधिकांश तत्कालीन राजवंश द्वारा बनवाये गये थे। अतः मन्दिरों का राजनीति से सतत् सम्बन्ध रहा है। राजवंशों अपनी आस्था अनुसार शिव, देवी, विष्णु, कृष्ण, राम आदि के मन्दिर बनवाये राजाश्रित मन्दिरों की एक विशेषता था कि किसी भी राजा ने मन्दिर को अपने नाम से नहीं जोड़ा। प्रत्येक मन्दिर प्रधान विग्रह से ही जाना जाता रहा है।

अध्यात्म एवं राजनीति के अतिरिक्त मन्दिर स्थापत्य कला के भी अनुपम प्रतीक है। उत्तर भारत एवं विशेष कर दक्षिण भारत के मन्दिरों की गोपुरम पर उनकी मूर्तियां स्थापत्य कला, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अभिन्न अंग है, का जीवंत दृष्टांत है।

राज्य आश्रित मन्दिरों को सशस्त्र राज्य संरक्षण की आवश्यकता यवनों के आक्रमणों के साथ हुई। यवन मन्दिरों को खंडित करते रहे राजा उनके पुनः निर्माण एवं सौंदर्यीकरण करते रहे।

मध्यकाल में वृंदावन से श्रीकृष्ण की प्रतिमा लेकर गोसाईगण चितौड़ के महाराणा के पास आए और महाराणाओं ने पहाड़ियों में सुरक्षित स्थान नाथद्वार में प्रतिमा स्थापित की।

उत्तर काल में महाराज रणजीत सिंह एवं अहिल्याबाई होल्कर ने काशी विश्वनाथ मन्दिर की पुनर्स्थापना की एवं सौन्दर्यीकरण में विशेष योगदान दिया। उन्होंने अन्य मन्दिरों को भी सुरक्षा एवं धन की व्यवस्था करवाई।

स्वतंत्रता के पश्चात् सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से सोमनाथ मन्दिर का पुनः निर्माण हुआ।

सन् 2024 में 500 वर्ष की पीड़ा के पश्चात केंद्र सरकार के संरक्षण में राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर की स्थापना हुई।

भारतीय मन्दिर आध्यात्मिक, पुरुषार्थ चतुष्टय, कला-संस्कृति एवं भक्ति की भावना के सनातन स्वरूप हैं। ■

দুর্গা বাহিনীর পরিচিতি বর্গ, দাঁতন, মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

"উঁচুতে উঠতে হলে, তোমার ভিতরের
অহঙ্কারকে বাইরে টেনে বের করে আনো
এবং স্বয়ং হালকা হও।
কারণ তারাই উঁচুতে ওঠে
যারা হালকা হয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

SKIPPER
PIPES

INDIA'S FASTEST GROWING POLYMER PIPES AND FITTINGS COMPANY

PLUMBING | AGRICULTURE | BOREWELL | BATH FITTINGS | TANK

Toll Free:1800 120 6842 | www.skipperpipes.in

Follow Us:

Delivering Quality, Powering Lives.

In a short span of three decades, Skipper Limited has rapidly risen to the top. As one of the most preferred brands in the sector, we are committed to delivering true value to our customers.

Manufactured using state–of–the-art processes and materials, all our products conform to international standards & norms. Skipper's product portfolio includes Towers & Distribution structures used for Power Transmission & Lighting, as well as EPC projects and Polymer Pipes & Fittings for water supply & irrigation systems.

Today, Skipper stands among India's largest, and among top 10 globally in terms of manufacturing capacity in the engineering products segment. We are also one of the fastest growing Polymer Pipes & Fittings manufacturing co. in the country.

SKIPPER
Limited

TOWERS | POLES | POLYMER PIPES
BATH FITTINGS | TANK

Registered Office
3A, Loudon Street, Kolkata- 700017, West Bengal, India
Phone: +91 33 2289 5731/32 | Fax: +91 33 2289 5733
E mail@skipperlimited.com | www.skipperlimited.com

VISHVA HINDU VARTA
Phone : 2555-3589

RNI NO. : 30136

15th August, 2026
Price : Rs. 15 only

धर्मो रक्षति रक्षितः

A LEGACY OF CULTURAL COMMITMENT

Respected Chairman
of Rashmi Group,
Shri Sajjan Kumar Patwari,
had the Divine Blessings
to take part in the
Ram Mandir Pooja
in the distinguished presence of
Shri Yogi Adityanath,
the Honorable Chief Minister
of Uttar Pradesh.

Rashmi Metaliks Limited / Rashmi Cement Limited / Orissa Metaliks Pvt. Ltd.

RASHMI GROUP

Registered Address - Premlata Building, 6th Floor, 39 Shakespeare Sarani,
Kolkata, West Bengal, 700017, India
www.rashmigroup.com

RASHMI GROUP

Publisher : VISHVA HINDU PARISHAD, Dakshin Banga ● 33, Bhupen Bose Avenue, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004
Printed at Aditya Graphics & Printing ● B/15/1/H/2, Balai Singha Lane, P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009
E-mail : vishvahindu1975@gmail.com